

শাশ্বত সুন্দরের
অনিবার্য অভ্যর্থনা কবিতা



কালান্তক



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

প্রাণে প্রাণের অনুরণন কবিতায়

কালান্তক

আবৃত্তি উৎসব ২০১১

২৩-২৪ জানুয়ারি ২০১১
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পিডিএফ সংরক্ষণে-
কার্যকরী পরিষদ ২০১৯-২০ (নবম কাউন্সিল)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

উৎসর্গ
আবৃত্তিকর্মী ও আবৃত্তিপ্ৰেমীদেৱ

কালাভক

আবৃত্তি উৎসব ২০১১
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

২৩-২৪ জানুয়ারি ২০১১
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ মিলনায়তন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

মাহুম আহমেদ

সম্পাদনা সহযোগী

সেলিম রেজা সাগর

কৃতজ্ঞতা

জামাল উদ্দিন

শাখাওয়াত শিবলী

প্রচন্ড

মধু মণল

বর্ণবিন্যাস

মাহতাব শফি

মুদ্রণ তত্ত্বাবধান

বলাকা প্রকাশন

৪০ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

ওভেচ্ছা মূল্য ৩০ টাকা

সূচি

সবার রবীন্দ্রনাথ	৭
ড. মনিরজ্জামান	
উচ্চারণের নিয়ম	১৫
ড. মাহবুবুল হক	
এই পাহাড়ের পাখি ও ফুলেরা	১৮
ওমর কায়সার	
আবৃত্তি	২০
কামরূল হাসান বাদল	
শধু কবিতা পড়া নয়, আবৃত্তিকার হওয়া	২২
ইন্দিরা চৌধুরী	
অফুরন্ত সন্ধাবনা আছে আবৃত্তির	২৫
রাশেদ হাসান	
আবৃত্তি : কবিতা নির্বাচন ও নির্মাণ প্রসঙ্গ	২৭
ফারক তাহের	
আবৃত্তি নিয়ে দু'চার কথা	৩১
মাছুম আহমেদ	
সংস্কৃতি : আঁধার পথের আলোকবর্তিকা	৩৪
সেলিম রেজা সাগর	
আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা ২০১১	৩৬

সম্পাদকীয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ'র উৎসবের অন্যতম অনুসঙ্গ কালান্তক। কালান্তক কোনো দুঃখ-সারবী নয়, উৎসবে রঙিন। উৎসব আয়োজনের কষ্ট-ক্লান্তি, অপূর্ণতার ক্ষরণ, দ্রোহের দৃঢ়তা ও আবেগের বহমান ধারা মিশে আছে ঐ রঙে। যাঁরা লিখলে প্রকাশনা খালি হয়, তাদের অবিরাম ব্যস্ততায় কালান্তক-ও যুক্ত হয়। তাগাদা দেয় লেখার জন্য। কালান্তক-কর্মীদের জুলাতনে অতীষ্ঠ হয়ে কিংবা ভালোবেসে কিছু কিছু লেখা কলমের ডগা ভেদ করে ভূমিষ্ঠ হয়। কেউ কেউ আবার আগেই জন্ম নেয়া প্রতিষ্ঠিত লেখা ছাপানোর সম্মতি দিয়ে বাধিত করেন। কালান্তক'র এ সংখ্যায়ও আলোচ্য ব্যঙ্গনাটুকু সাবলীল।
প্রাণে প্রাণের অনুরণন কবিতায়- স্নোগানের ধারক হলো কালান্তক। আশা-নিরাশার দোলাচলে কবিতাই আমাদের অনেকটুকু স্পষ্ট-নির্ভরতা। কাব্যপ্রেমের এই বীজতলায় প্রতিটি সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষ ও কষ্টসেনিককে অক্তিগ্রাম স্বাগতম-অভিবাদন।

ছাপা বইকে অর্মাদাকর মনে করতেন, ঝুঁকিকেও সামলাতে হতো ব্যবসায়ীদের। শেকসপীয়র ছাপা বইকে অর্মাদাকর মনে করতেন, কারণ সৎ পাঠকেরা কষ্ট করে পাঞ্জুলিপি নকল করাতেন ও তার মর্যাদা দিতেন তখনকার দিনে। সন্তুষ্ট হওয়ার দায়ে শুধু তাঁরাই পাঞ্জুলিপিচর্চায় মনোযোগী হতেন বা অর্থব্যয় করতেন। বইপড়ার সংকৃতিটা অপেক্ষাকৃত নতুন এবং হালে আবার পুরনো হয়ে পড়েছে।

সাধারণ পাঠক ঘড়ির দোলকের মতো। একবার ডাইনে তো একবার বাঁয়ে। একবার পূবে তো একবার পশ্চিমে। এই তাদের হেলন-দোলন স্বভাব। আজ অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, রবীন্দ্রসূর্য এখন অস্তগামী। তবে সমস্যা, অনেকেই আবার তা গোপন করেন সামাজিক অবস্থান হারাবার ভয়ে। যাঁরা রবীন্দ্রবিরোধী, তাঁরা সমাজে ব্রাত্য। কিন্তু যাঁরা অর্ধগোপন বা যাঁদের গুপ্তই বলা যায়, তাঁরা গোপনে বা অর্ধপ্রকাশ্যে যেভাবেই রবীন্দ্র-সমালোচনা করেন, তাঁরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতেন রবীন্দ্র-বিরোধীদের সাথে তাঁদের স্পষ্টই পার্থক্যও আছে। রবীন্দ্রবিরোধিতা এখন একটা রাজনৈতিক প্রথামাত্র এবং তাঁদের অনেকেই একটা বাড়াবাড়ির সীমান্যায় অবস্থান নেন কিংবা উচ্চানিমূলক ও সাম্প্রদায়িক আলোচনার আশ্রয় হয়ে ওঠেন। ‘সাহিত্যিক সন্ত্রাস’ বলে কিছু আছে কিনা জানি না, হয়ত এর মাঝে তার স্বরূপ পাওয়া যাবে।

এ সবকে আমি বলি সময়ের সৃষ্টি। মার্কসবাদী আলোচনাও যেমন এক সময় তুঙ্গে ছিল, ‘মৌলবাদী’ আলোচনাও তেমনি চূড়াস্পর্শী। সময়-ঘড়ির পেন্ডুলামের এই দ্বি-সীমান্তবর্তিক চলাচল প্রবণতাকেই বলে কালের রথযাত্রা।

আমাদের কৈশোরে সুকান্ত সেই কালটাকে ধরে নাড়ি দিয়েছিলেন। এটাকে কি বলা যাবে? শুধুই ব্যতিক্রমী? এর পশ্চাতে কি কালের ভূমিকা কিছুই ছিল না? সে সময় একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। এটা আমার কৈশোরিক বিদ্রম বা আসক্তিও বটে। কলেজে পড়াকালে আমি একটা বিদেশী কসমোপলিটান হোস্টেলে থাকতাম, যেখানে সব কলেজের ছাত্রাই থাকতে পারতো। সেখানেই পরিচয় হয় পরবর্তীকালের অর্থনৈতিবিদ আজিজুর রহমান খানের সাথে। তাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে ময়মনসিংহে বেড়াতে গিয়ে টাউন হলে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ওপর বক্তৃতা করতে দেখেছিলাম। এ সেই ছেলে। ‘বালকের মুখে রবীন্দ্র-আলোচনা’— এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্যই মনে হচ্ছিল। কিন্তু তখন আমার কাছে মনে হচ্ছিল এই সেই সুকান্ত, যার ‘আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়’। তার সেই জনমুক্তকর আলোচনা উপবিষ্ট সকলের মতো সেদিন আমাকেও যে মুক্ত করেছিল, সে-কথা আজও ভুলতে পারিনি। এই উদাহরণের অর্থ এই যে, রবীন্দ্রনাথের সারকথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে বয়স, বিদ্যা বা প্রশিক্ষণ নয়, বরং আগ্রহ এবং শ্রমই যথেষ্ট। আর সেটি যুগিয়ে দিতে কালেরও কার্পণ্য ঘটে না, শুধু নিতে হয় দু'টি হাত বাড়িয়ে।

কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন করা যায়। জন্ম-মৃত্যু সময়াধারের সেই রবীন্দ্র-বৈশাখে বা শ্রাবণে অধ্যাপক কিংবা সাহিত্যকর্মীদের পাশে কেনও ‘বালকের’ উপস্থিতি এত গভীর হল কেন? আমি যে-সময়টার কথা বলছি তাহলে সে-সময়টা কেমন ছিল? আসলে তখন পঞ্চাশের দশক গড়াতে শুরু করে দু’এক পা এগিয়ে গেছে (১৯৫৩)। তখনকার দিনটা ছিল ‘নতুন সাহিত্যের’ দিন এবং প্রগতি চেতনার কথা ছাত্রমহলে ছিল মুক্তির সনদস্বরূপ। সুকান্ত আঠারো তখন অগ্নিবারুদ্ধ। ভাষা-আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে এবং চলছে, গাফফার চৌধুরীর, ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেক্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি’ সবার কংগে কংগে ঢাকার বুদ্ধিচক্রে ও তরুণ সমাজে তখন অগ্রত্যা’র শ্লেষ, সাংস্কৃতিক চতুরে হাতে হাতে ঘুরছে দাঙ্গার পাঁচটি গল্ল, পিজরা পোল, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্ল, সাবেক কাহিনী। লালসালুও এসে গেছে ততদিনে। সাহিত্যকর্মীরা পথ পেয়ে গেছে চন্দ্রমুপের উপাখ্যান, পথ জানা নেই, সামনে নতুন দিন, চরভাঙ্গার নয়ান ঢুলি, জিবরাইলের ডানা এবং পরপর জেগে আছি, ধানকন্যা, মৃগনাভি-র মধ্যে; সৈয়দ শামসুল হক এসেছে তাস নিয়ে— একটু পাহে আসবে জহির রায়হানের সূর্যগ্রহণ। মাহেনও-মোহাম্মদীর ভাস্ত প্রচারের মুখে দাঁড়িয়ে এইসব গদ্যভাষার অমিতসম্মত সৃষ্টি ও স্ফুলিঙ্গের পাশাপাশি সুকান্ত-নজরুল-রবীন্দ্র জয়তীর প্রাতিস্থিক চর্চা চলতে থাকে। অন্যপ্রাণে উত্তাল পল্টনের প্রতিদিনের রাজনৈতিক বিকেলসমূহ সে-সময় ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন আন্দোলনের যে পটভূমি সৃষ্টি করছিল, নবযুগের ছাত্রমহলকে নিমেষেই যেন তা সচেতন ও আশাবাদী করে তুলেছিল।

এইসব ঘটনা, প্রকাশনা ও কর্মোদ্যোগ কি নগরে কি মফস্বলে একদিকে যেমন ষাটের পূর্বপন্থত্বস্বরূপ ছিল, তেমনি ছিল এক স্বতন্ত্র বিশ্বারণের শক্তিস্বরূপও। এইরকম এক ঐতিহাসিক কালে রবীন্দ্রচেতনার একটা মান তৈরি হয়ে উঠেছিল। নবীন-প্রবীণ সবার কাছেই রবীন্দ্রনাথকে জানতে চাইত মানুষ। এভাবেই সেময়ে শিহরণ এবং কালের চেউ এসে অপামর জনসাধারণকে স্পর্শ করেছিল সমানভাবে। মনে পড়ে আমি নিজেও সেই অঞ্চলবয়সে গ্রামে বসেই ‘২৫ শে বৈশাখ’ শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সন্তুষ্ট এটাই ছিল আমার প্রথম সাহিত্যিক গদ্য। সময়কে আমি এভাবেই বুঝতে চেষ্টা করি।

এখন সময়ের প্রেক্ষাপট বদলেছে। রবীন্দ্রচর্চার মান হয়েছে ভিন্ন। এখনও কি রবীন্দ্রনাথ সবার? না, আগেই বলেছি রবীন্দ্র বিরোধীদের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখার ভিন্নমাত্রা রচনার চেষ্টাও তবু চোখে পড়ে। যদিও সেটা এখন পর্যন্ত ক্ষীণ। এখনকার সমস্যা রবীন্দ্রবিরোধীদের নিয়ে নয়, রবীন্দ্রভক্তদের নিয়েই। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে এভাবে গ্রহণ করেছেন, যেন তিনি একটি

আলোর শিখা এবং ভঙ্গরা পতঙ্গ মাত্র। যাঁরা কাছে গেছেন তাঁরা পুড়েছেন অর্থাৎ অস্তিত্বার হয়েছেন বা নিজস্ব সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়েছেন। আর যাঁরা দূর থেকে তাঁকে অবলোকন করেছেন তাঁরা নার্সিসাসের মতো মুক্ষ থেকেছেন নিজস্ব প্রতিবিম্বের জলে; তাঁরা নিজস্বতার ঠিকানায় রবীন্দ্রসন্ধাকে মিলিয়ে ফেলেছেন। হয় তাঁরা রবীন্দ্রবলয়ে প্রবেশ করে অভিমণ্যুর পরিণতি গ্রহণ করেছেন, না হয় আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে রবীন্দ্র পাদস্পর্শে মুক্তিলাভের জন্য ও নদিত হবার দুরাশায় স্বেচ্ছায় অহল্যার পাশাণ-কৌমার্য ধারণ করেছেন। রবীন্দ্র-পাঠক ও ভঙ্গদের এই বিচিত্র ধরনটি রবীন্দ্রনাথের জীবদ্ধশায় এবং মৃত্যুতে যেমন কোনও প্রভেদ আনে নি, কালের বিবর্তনও সেখানে ভেদরেখা গড়তে পারেনি আজও।

রবীন্দ্রবিচারের মাত্রা যুগে যুগে ভিন্ন হবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিচারের নামে প্রহসনও কম হয় নি, ইতিহাসে তার স্বাক্ষর রয়েছে। সংস্কৃতির বিবর্তন এবং পুনরাবর্তন বা অতীতমনক্ষতা এক কথা নয়। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতিকে বার বার চড়ায় নৌকা আটকাবার দশায় ফেলার চেষ্টা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে করা হয়েছে মূল লক্ষ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে পাবনা অধিবেশনে, কিংবা নোবেল পাওয়ার আগে কবিকে নিয়ে ঠাউনিন্দার নাটক আনন্দ বিদ্যায় নাট্যাভিনয়ে, বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট হাউসে রবীন্দ্রনাথের বজ্রাকালে, ‘সাম্রাজ্যবাদী’ জাপান সম্মাটের আমন্ত্রণে প্রশান্ত মহাসাগরে যাত্রাকালে সিঙ্গাপুর জাহাজঘাটে, এবং আরও কয়েকটি স্থানে এমন কি কিছু কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটেছে।

পশ্চিমেও প্রতিক্রিয়া ঘটেছে নানা রকম। ম্যাকমিলান কোম্পানীর গীতাঞ্জলির ভূমিকা লেখার পর কানকথা শুনে কবি ইয়েটস বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন; টি.এস.এলিয়টের গুরু কবি এজরা পাউল এবং আরও কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে এশিয়ার প্রতিভূত ভাবতে অঙ্গীকৃতি জানান এবং চীন ও জাপানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। রঁম্যা রঁলাও শেষের দিকে প্যারিসে রবীন্দ্র-শিল্পকলার প্রদর্শনীকে ফরাসি দেশের দুর্ভাগ্য বলে সমালোচনা করলেন (যদিও সেই সময় প্রদর্শনী-দেখা এক ড্রাইভার রবীন্দ্রনাথকে প্যারিসের বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন, কোন ভাড়া না-নিয়ে এবং আন্তরিক সম্মান দেখিয়ে) ইত্যাদি। এরকম ঘটনা-দুর্ঘটনা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি। তথাপি বিশ্বকবি তাঁর স্বাসনেই অটল ও বরেণ্য হয়ে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কোনও ক্ষতি হয় নি এসব অশুভেলার তাৎপর্যহীন বিপুলতায়।

কিন্তু একথা কি তবুও জোর করে বলা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁর বিশেষ পাঠকেরাই? রবীন্দ্রনাথ নিয়ে চর্চা করেন, তাঁর গ্রন্থ পড়েন বা তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করেন এমন পাঠকের পরিচয় কর্তব্য সত্ত্বাগ্রন্থক? রবীন্দ্র-পাঠক তো তারাই যারা সাধারণভাবেই সাহিত্যের পাঠক। তার অতিরিক্ত ‘বিশেষ’

উপাধি আছে কি সেই ‘মহৎ’ পাঠকদের? বিশেষত এই যুগের মিডিয়া তথা চ্যানেল-প্রিয়তার কালে? রাজনীতিমুখো সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাদেরকে কি খুব বেশি করে খুঁজে পাওয়া যাবে? তাছাড়া উপযোগিতা (এটা যদিও স্বার্থেরই অপর নাম) এবং প্রয়োজনীয়তার দর্শনভুক্ত সমাজ অকারণে বা বিনা প্রয়োজনে কেন সাহিত্য এবং ‘বিশেষ সাহিত্য’ পড়তে চাইবে?

বলা বাহুল্য সাহিত্যের কিছু অকারণ পাঠক থাকে, যাদের মধ্যে মহিলা এবং কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যাই অধিক। কথায় বলে কাজ নেই তাই চাচার নামে মামলা ঠোক। এরা সেই দলের। আমি এক অধ্যাপকের কথা জানি যিনি কর্মস্কেত্রে প্রায় প্রতিদিন থলে হাতে বাজারে দায়িত্বান্ত গৃহকর্তার ভূমিকা পালনে বের হন এবং গভীর রাতে বা পরদিন ভোরে ছেট কেতাব পড়া শেষ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। অন্য কেতাব অর্থাৎ সাহিত্যের নিকুঠি করার দলে তিনি প্রথম। অথচ শঙ্গুরালয়ে তিনি সুবেশ তথা ‘লেজবিশিষ্ট ভদ্রলোক’ এবং তাঁর অন্য পরিচয় তিনি সাহিত্যের (চাই ইংরেজী, বাংলা, সামনে যা আসে) একনিষ্ঠ পাঠক। তিনি অবসর সময়ে এ ভাবেই কাটান কোন রিডিং মেটেরিয়েলস সাবাড় করে। অথচ সাহিত্য আলোচনায় তাঁর অনীহাই কেবল চূড়ান্ত নয়, সাহিত্যিকদের মাথা মুড়াতে কেবল বাকি রাখেন।

আমাদের সমাজ এই রকম পাঠকেরই আখড়া বিশেষ, এরাই সমাজের এবং সংস্কৃতির দলপতি। হতোম পেঁচার নকশায় আছে, এক মায়ের তিনি ছেলেই পাগল। বড় ছেলে একদিন তার মাকে নাকি বলেছিল, ‘মা তোমার গভর্টাই একটা পাগলাগারদ।’ আমাদের সমাজের এখন সেই অবস্থা। তাই ভাবতে অবাক লাগে এর পরেও রবীন্দ্রনাথ কি করে এখনও আলোচনায় উঠে আসেন? পরীক্ষার প্রয়োজনেও ছাত্ররা যেখানে রবীন্দ্রপাঠে বিরত থাকে, সেখানে এরকম আশ্চর্যবোধ করাই স্বাভাবিক নয় কি?

প্রয়োজনের দর্শন ঠেলে রবীন্দ্রনাথ কি করে উজানে আসেন এই রহস্যের মধ্যেই সমাজের ইতিবাচক কোনও শক্তি হয়ত কাজ করে।

এবার রবীন্দ্র সংখ্যার কোনও কাগজে (অবশ্যই দৈনিক) দেখলাম রবীন্দ্রপাঠকের জরিপ বেরিয়েছে। পাঠকেরা প্রায় সবাই একবাক্যে বলেছে রবীন্দ্রনাথ পড়ি না, কঠিন লাগে। ছেলেবেলায় শোনা-কথা রবীন্দ্রনাথ বড় কবি, সেই রবীন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যে কখনও স্বত্ত্বান্বেশ এবং রবীন্দ্র ঝুতুতে প্রায় প্রত্যহ নজরুলের সাথে মন্ত্রযুক্তে নামেন, কিন্তু ফলাফল অধীমাংসিত।

উপযোগবাদ বা প্রয়োজনীয়তার দর্শনে রবীন্দ্রনাথ বাদ পড়েন বলে রাজনীতি বা রাজনীতি-দর্শনে কোন কোন দল এটাকে কাজেও লাগায়। তিরিশের যুগে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সময় তারা বেশ ভাল কাজে লাগিয়েছেল এই সুযোগটা। রবীন্দ্রনাথ

সেদিন ছিলেন সামন্তপ্রভুর দলে, উপনিবেশী শক্তির পক্ষে। এমন কি ফ্যাসিস্টদেশ ইতালি-জার্মান প্রাতিবশবর্তী। মার্কসীয় বিচারে রবীন্দ্রনাথের যথন তুলাধুনা হচ্ছে তখনই কিন্তু সুকান্তরাই (সুকান্ত পাঠে উজ্জীবিতরা) এই বিশ্বাসে ও প্রত্যয়ে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে যে রবীন্দ্র সাহিত্যই মুক্তির দ্বারপথ। আবার তেমনি দেখি, মৌলবাদী চিন্তা তখনও ঠাই পায় নি, সে-সময় রবীন্দ্রবিরোধীরাই মার্কসীয় সমালোচনার উপজীব্যতাকে ধরিয়ে দিয়েছিল সহজেই।

প্রগতিধারার পত্রিকা নতুন সাহিত্যে বিহার সীমান্তের এক মরণাপন্ন বৃক্ষের কথা লেখা হল এভাবে যে, অস্তিমকালে সেই অর্ধজীবিত লোকটি জীবনের সংশ্লিষ্ট খুঁজে পেয়েছিল রবীন্দ্র সংগীতের মতো আশৰ্য ধ্বনিস্তোত্র শ্রবণ করে; যে-অবিশ্বাস্য সুরতরঙ্গ না-শুনে তার এতটা কাল কেটেছে। তাকে আবিক্ষার করে এক নতুন জীবন পেয়ে সে বলে উঠেছিল, ‘এই সুর না শুনেই আমার মৃত্যু হচ্ছিল; কি হতভাগ্য মৃত্যুই না হতো আমার!’ সুতরাং বোঝা গেল, রবি ঠাকুরের গান এবং সাহিত্য দুই-ই সামন্ত স্বার্থরক্ষক হয়েও প্রগতিবাদীদের রক্ষাকৰ্ত্ত হয়ে ওঠে এক নিমেষে, নিশ্চয় অসাধারণ কোন বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে। নাকি এটাই ‘পাঠকের মৃত্যু’ কিংবা গুণ!

মাঝে মাঝে ভাবতে ইচ্ছে করে রবীন্দ্রনাথ বিদেশে কেমন আছেন? শান্তি-নিকেতনের বিদেশী বন্ধুরা (টমসন এবং অন্যেরা) রবীন্দ্র জীবদ্ধশায় এক রকম বিশ্বেষণ করেছিলেন। শোনা যায় এডওয়ার্ড টমসনের ওপর রবীন্দ্রনাথের খুব আস্তা ছিল। পরে, টমসনের অনুবাদ বা আলোচনা অনেকেই খারিজের পক্ষপাতী হন। জার্মান ভাষায় ১৯১৩ সালেই কুর্টউলফ রবীন্দ্র অনুবাদে হাত দেন এবং রবীন্দ্রসমগ্র বের করেন। পরে রাশিয়া ও ফ্রান্সে এবং জাপানে ও চীনে রবীন্দ্র অনুবাদ প্রশংসিত এবং জনপ্রিয়তার তালিকা অর্জন করে। সম্প্রতি শোনা গেছে হিন্দু ভাষায় গীতাঞ্জলি অনুদিত হচ্ছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-আবেদন এখনও নানা ভাষায় তুল্য-গ্রন্থসমরামান। এর ভেতরেও নানা স্কুল নানা দর্শনভাগীরা নানা দৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছেন। যেমন রবিনসনের সাম্প্রতিক যে অনুবাদ (বহুদাকার), উইলিয়ম রাদিচির কবিদ্রষ্টি ও বিচারবোধ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পেংগুইন-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হয়েছেন রাদিচি। উল্লেখ্য, বোলটন এবং তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের পরে ল্যন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদেশীয় ভাষা স্কুলের বাংলা বিভাগের দায়িত্ব পড়েছিল উইলিয়মের ওপরে। বর্তমানে বিভাগীয় প্রধানের নাম হানা টম্পসন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন এবং বিশে ছড়িয়ে দিয়েছেন সেই মদনতস্মকে, যার ফলে পৃথিবীর এখানে ওখানে গড়ে উঠেছে নানা রবীন্দ্রতীর্থ। খুব আলোড়ন জাগিয়ে, সাড়জাগানো ব্যাপার ঘটিয়ে প্রচার করে এমনটা হচ্ছে বা হয়েছে তা কিন্তু নয়। ‘নাহি জানে কেউ/ রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ, / কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা’—সেই রকম। রবীন্দ্রনাথ এমনিভাবে সবার ভেতরে ভেতরে

পুষ্টি লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে নিজেদের করে রাখা এই নিয়েই যেন এখন প্রতিযোগিতা। যেমন প্রগতিবাদীরা এড়িয়ে এসেছেন, তেমনি বিদেশে সাম্যবাদীরা এবং স্বীকৃতিবাদীরা এবং রবীন্দ্রনাথকে বিদেশে কেন গ্রহণ করে, এদেশ কেন অবহেলা করে এই সমাজদর্শন বা সমকালীন সাংস্কৃতিক চিন্তার সক্ষট বা অপল্লাবতার কথা নিয়ে এখানে আর কিছু বলতে চাই না, কিন্তু একটা কথা বলা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর আগে মাইকেল মধুসূদন কি আসলে স্বদেশী কবিদেরই কোনও উত্থান? নাকি ‘ভিন্নদেশী এক আগন্তুক’? বুদ্ধদেব বসু, জিল্লার রহমান সিদ্দিকী প্রযুক্ত যেন এ ধরনের সন্দেহ উত্থাপন করেন এবং সমাধান সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। সৈয়দ আলী আহসান যেমন বলেন, মনস্তাত্ত্বিকভাবে রবীন্দ্র-ইমেজে বাঁধা রয়েছে অজস্র ‘শব্দরাজি’। অর্থাৎ তিনি পুরনো, আধুনিক রুচি-বহুভূত, পরিত্যাজ্য। যেটুকু চলে সেটা প্রথামান্যতার কারণেই। এখনকার ‘শব্দ’ কি আর অত্থানিই নির্লিঙ্গ, নির্বীর্য এবং কালমনক্ষত্রবিহীন?

কিন্তু এখানে ‘শব্দই ব্রক্ষ’ ধরে এগুলো চলবে না। ‘শব্দ’ সাহিত্যের সেই উপাদান যা অভ্যন্তরীণ বন্ধনকে ধরিয়ে দেয়, এগিয়ে দেয়। আর রবীন্দ্রসাহিত্য সমাজবন্ধনের রূপ এবং সামাজিক বিবর্তনের প্রত্যাশা একই সাথে প্রকাশ করেছে। দার্শনিক ও ইতিহাসতত্ত্ববিদ ড্রু. রঞ্জিন একবার বাল্মীকি ও কালিদাসের তুলনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন উভয়েই রাম ও সীতার ছবি এঁকেছেন কিন্তু উভয়ের চিত্র থেকেই সমাজবাসী তথা নাগরিকগণ এই জন্য উপকৃত হয়েছেন যে, তাঁরা স্ব স্ব কালের কবির মধ্যে নতুনকালের বাণী তথা আধুনিকতার অভিযোগ দ্বারা পুনঃসিদ্ধিত হয়েছেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘদূত’ বিষয়ক কবিতায় শুধু কালিদাসকেই পাই না, সেকাল-একাল মিলিয়ে চিরপ্রবহমান এবং অভীষ্ঠ এক কালে উপনীত হই। কালের পুনর্নির্মাণে এবং কালের উত্তরণে কবিতাটি যে মহাত্ম অর্জন করেছে, ‘শব্দ’ তার এক উপযোগী বাহন মাত্র। সে পেছনে ফেলে আসে ঐতিহ্য-ভাষার ঐতিহ্য, দর্শনের ঐতিহ্য, ইতিহাসের পশ্চাংধোরা। কবে ছান্দোগ্য উপনিষদের কোন পৃষ্ঠায় উদ্দালক অরণি যাজ্ঞবক্ষ্যকে উত্তোজিত করার মতো কোন মন্ত্র উক্তি করেছেন, বুদ্ধের সমবর্তীকালের কোন রাজা আত্মা ও শরীর নিয়ে পরীক্ষামূলক কোন কর্মে উদ্দেয়গী হয়ে যুদ্ধবাদীদের আনুগত্যের দিকে ধাবিত করেছিলেন, সাংখ্যতত্ত্ব প্রকৃতির গুণ পুরুষনির্ভর কিনা, এসব তত্ত্ব ভারতীয় দর্শনকে যে দিকে ঠেলে দিয়েছিল, যুগে যুগে সাহিত্য বা মহাকাব্যে কবিদের চিন্তাধারায় তা প্রকটিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তা করেছে উপভোগ, গ্রহণ করেছে মিথ বা পুরাণে ও ধর্মে, বিশ্বাসে এবং প্রাতিষ্ঠিক সংস্কারে। তার সবই উঠে এসেছে শব্দে। তবু ‘শব্দ’ আসলে অর্থহীন।

গ্রীক সাহিত্য যেমন গ্রীক দর্শন থেকে দূরে নয়, তা যেমন থেলসের, তেমনি উত্তরে আয়নদেরও। (এবং উভয়ের কৃতিমিশ্রণ ও সংশ্লাঘনে বটেই)। ভারতীয় কবিদের সেভাবেই

আমরা চিন্তা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম নন। রবীন্দ্রনাথ অধ্যবসায় দ্বারা তা অর্জন করেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানেই থেমে থাকেন নি। পশ্চিমে রবীন্দ্রসাহিত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে ও রবীন্দ্র-আকাঙ্ক্ষায় বিশেষ প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হতে থাকায় তিনি ভারতীয় দানকে পশ্চিমের জানালার রোদে মেলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সমালোচনার একটা বড় কারণ এটাও। রবীন্দ্রদর্শন এবং সাহিত্য নিয়ে পরে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের কাছে এটা খুব আশ্চর্য মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের বৈদিক চিন্তা ক্রমে বৃদ্ধি-যাত্রায় ও শেষে যীগুর করণা ভিক্ষায় পরিণতি নিছিল।

টি.এস.এলিয়টের গীর্জামুখিতা আর রবীন্দ্রনাথের মানববাদী যীশু-বন্দনাকে এক করে ফেলায় এই ভাস্তি ঘটে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপরও দেখা যায় জার্মান সমালোচক ও রবীন্দ্রভক্ত গিসেলা হার্ডৎ (G Herdt) রবীন্দ্রদর্শনে এমন নতুন অনেক কিছু পেয়েছেন যেখান থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে এসবই রবীন্দ্রনাথের বহির্ভারতীয় সংযোজন। বিনয় ঘোষ একবার রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় কৌৎসুত্বের বিষয়কে যুক্ত করে রবীন্দ্রদর্শনের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। গিসেলার মতেও দেখি রবীন্দ্রনাথের সু এবং কু-এর ধারণায় ভাল/মন্দ বৈপরীত্য অপেক্ষা ভাল ও সত্ত্বের সমীকরণ (রাইট এন্ড গুড) করেন এবং জার্মান নাট্যকার ফিডলার যেমন বলেন (ফিডলার'স ফর্মুলা), সেভাবেই ইতিবাচকতার দিকে মনোযোগী হয়ে কবি সত্য ও কল্যাণের চিরস্তনতা কামনা করেন। রবীন্দ্রনাটকেই বিশেষ করে এই শ্রেণোবোধক ও নীতিআশ্রয়ী শিক্ষামূলক (ডাইডাকটিক ও মোরালিস্টিক) চিন্তার উত্তাসন লক্ষ্য করা যায়। ফ্রেডরিখ রেইলার এসক কারণ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথকে 'নন-ব্যাপটাইজড ক্রিচিয়ান' (অদীক্ষিত খ্রিস্টান) বলেছিলেন। এসব প্রসঙ্গে নিয়ে আরও যে সব কথা বলা দরকার, তার অবকাশ এখনে নেই। আমাদের বলার উদ্দেশ্য, রবীন্দ্রনাথ যেমন নিন্দায় ব্রক্ষ, প্রশংসায় ব্রক্ষ। রবীন্দ্রনাথের একটাই পরিচয়- তিনি জাতীয় বা বিজাতীয়, এদেশীয় বা বিদেশীয় নন, দীক্ষিত বা অদীক্ষিত নন, আমাদের বা তোমাদের নন, তিনি শুধুই রবীন্দ্রনাথ। শক্রণও তিনি যিত্রেরও তিনি; সমালোচকেরও তিনি, ভক্তেরও তিনি। তিনি ক্ষুদ্রের নন, বৃহত্তের। পুরনো হয়েও নতুনের। তিনি সবার।

লেখক : বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী-কবি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অনসরপ্রাণ অধ্যাপক এবং চবি আবৃত্তি মঞ্চ'র উপদেষ্টা।

উচ্চারণের নিয়ম

ড. মাহবুবুল হক

লিখিত বাংলা ও মৌখিক বাংলা : যে কোনো ভাষাই জন্মস্থিতে ও গুরুত্ব বিচারে প্রথমত ও প্রধানত মুখের ভাষা। কিন্তু ভাষার লিখিত রূপকে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, উচ্চারণের দিকটি ততটাই উপেক্ষিত থেকে যায়। কিন্তু উচ্চারণ সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা না থাকলে কিংবা অস্বচ্ছ ধারণা থাকলে আধুনিক কালে ভাষা শিক্ষা অসম্পূর্ণ বিবেচিত হয়। কারণ, আধুনিক জীবনে শিক্ষিত সুশীল সমাজে বাচনিক দক্ষতা ও উৎকর্ষ সামাজিক মর্যাদার অন্যতম মানদণ্ড।

বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে, লিখিত বাংলা ও মৌখিক বাংলার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। লিখিত বা মুদ্রিত ভাষার পক্ষে ধ্বনি উচ্চারণ সম্ভব নয়। লেখায় বা ছাপায় হরফের নানা চিহ্ন দেখে আমরা বর্ণিত বিষয়বস্তু বুঝে নেই। এক্ষেত্রে আমাদের প্রধান সহায় চোখ। কানের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা এখানে নেই। পক্ষান্তরে মৌখিক ভাষা পুরোপুরি ধ্বনি নির্ভর। তা আমরা চোখে দেখতে পাই না। কানে শুনেই আমরা বক্তৃর বক্তব্য অনুধাবন করি। আনন্দ ও আতঙ্ক, বিস্ময় ও বিষাদ, উদ্বেগ ও উল্লাস ইত্যাদি ভাবাবেগের উপর নির্ভর করে ধ্বনির উচ্চারণে স্বরের যে তীব্রতা বা গভীরতা, লয়ের যে দ্রুততা বা মহুরতা, স্বরস্তরের যে উচ্চতা বা নিম্নতা হয়ে থাকে তা মৌখিক ভাষায় অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু লিখিত ভাষায় তা ধরা পড়ে না বললেই চলে। সেদিক থেকে ভাষার বাচনিক প্রক্রিয়া তথা উচ্চারণের দিকটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক কালে সংগীত, আবৃত্তি, নাট্যকলা ইত্যাদি উপস্থাপনা শিল্প (performing art) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয় হচ্ছে। এর ফলে ভাষার উচ্চারণের দিকটি ক্রমেই অধিকরণ গুরুত্ব পাচ্ছে।

কেবল আধুনিক কালে নয়, সুদূর অতীত থেকেই ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ আমাদের শ্রবণ যন্ত্র অর্থাৎ কান। তাই কেউ যদি জন্মগতভাবে বধির হয় তবে তার পক্ষে ভাষা আয়ত করা সম্ভব হয় না। ছেলেবেলা থেকেই আমরা ভাষা শিখি কানে শুনে। আর সেই কারণে আমরা যে মৌখিক ভাষা ব্যবহার করে থাকি তার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে আমাদের মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, ভৌগোলিক অঞ্চল ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে। আর এই কারণে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা হলেও একই কথা বা একই শব্দের উচ্চারণ সবার মুখে সব সময়ে একরকম হয় না।

কোনটি বাংলা উচ্চারণ?

উচ্চারণের আলোচনায় প্রথমেই আমদের স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার, সঠিক বাংলা উচ্চারণ বলতে আমরা কী বুঝি। কারণ, লক্ষ করলে দেখা যাবে, একই কথা দু'জন লোক উচ্চারণ করলে তা ঠিক একরকম হয় না। ‘আমি এই কলেজে পড়ব না’ কথাটার উচ্চারণ দু’জনের কঠে দু’রকম শোনাতে পারে। আবার ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদেও ভাষার উচ্চারণের পার্থক্য দেখা যায়। ‘আমি এই কলেজে পড়ব না’ কথাটির আঞ্চলিক রূপ বিভিন্ন উপভাষায় বিভিন্ন রকম হয়। যেমন:

চট্টগ্রামের উপভাষায়	: আই এই কলজত ন পইজ্জম।
সিলেটের উপভাষায়	: আমি এই কলজ ফরতাম না।
নোয়াখালির উপভাষায়	: আই এই কলেজে হইত্যান ন।
ঢাকার উপভাষায়	: আমি এই কলেজে পৱন্ম না।
ব্রাক্ষণবাড়িয়ার উপভাষায়	: আমি এই কলেজে পড়তাম না।
পাবনার উপভাষায়	: আমি এই কলেজে পড়তাম লয়।
বিনাইদহের উপভাষায়	: আমি এই কলেজে পড়ব না নে।
নেত্রকোণার উপভাষায়	: আমি এই কলেজে হড়ব না।
একই অঞ্চলে স্থান ভেদে এসব রূপেরও পার্থক্য হয়ে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, মুখের কোন ভাষাকে আমরা আদর্শ বা মান্য ভাষা হিসেবে গণ্য করব? কিংবা ‘আমি এই কলেজে পড়ব না’ কথাটি মান্য বা আদর্শ ভাষা হলে তা কোন নিরিখে মান্য বা আদর্শ ভাষা?	
বাংলা ভাষার উচ্চারণের নানা রূপভিন্নতা সত্ত্বেও ভাষার মৌখিক যে রূপটি বাঙালি সমাজে কিংবা বাংলাভাষী সমস্ত অঞ্চলে সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন এবং শিক্ষিত সমাজের লিখিত ও মৌখিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত তাকে বলা হয় মান্য চলিত ভাষা বা শিষ্ট চলিত ভাষা।	

বাংলা সাধু ভাষা দীর্ঘকাল ধরে কেবল লিখিত ভাষার ক্ষেত্রে মান্য বা শিষ্ট ভাষা হিসেবে প্রচলিত। তবে এক সময়ে তা একচ্ছত্র গুরুত্ব পেলেও আধুনিক কালে সাধু ভাষা ক্রমেই গুরুত্ব হারাচ্ছে। বর্তমানে গণমাধ্যম (রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, অডিও-ভিডিও উপকরণ), সাহিত্য, অভিধান, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে, বিদেশীদের জন্য শিক্ষণীয় বাংলা ভাষার রূপ হিসেবে এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সংজ্ঞাপন বা যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে মান্য চলিত বাংলাই আদর্শ গৃহীত হয়েছে। ফলে মান্য চলিত বাংলার উচ্চারণকেই বর্তমানে মান্য বা শিষ্ট উচ্চারণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

বানান ও উচ্চারণ

বাগধ্বনিকে বর্ণ বা হরফের সাহায্যে লিখিত রূপ দেওয়ার কাজ, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিই হচ্ছে বানান। কিন্তু বাংলা বানান সাধারণভাবে সর্বত্র অনুসরণ করে না। যেমন, বলি – ‘অতো’, লিখি – ‘অত’; বলি – ‘ওতি’, লিখি – ‘অতি’। এই পার্থক্যের অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে একটা বড় কারণ হলো, বাংলা বর্ণমালা এসেছে সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে অর্থে সংস্কৃতের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাংলায় ছবছ নেই। বাংলা উচ্চারণনীতি গড়ে উঠেছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এ জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বাংলার স্বকীয় ধ্বনিচরিত অঙ্গাহ করে তাকে সংস্কৃত বানানের পোশাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলা উচ্চারণ ও তার লেখ্যরূপ তথ্য বানানের মধ্যেকার অমিলের মৌলিক কারণ হলো উচ্চারিত ধ্বনি ও বর্ণমালার মধ্যে অসঙ্গতি। প্রচলিত বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঝ, এ, ঐ, ও, ঔ)। কিন্তু প্রমিত বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি (ই, এ, আ, অ, ও, উ)। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনি (diphthong) আছে দু’টি (ঐ,ঔ); কিন্তু মান্য চলিত বাংলায় কমপক্ষে ১৭টি যৌগিক স্বরধ্বনি (আই, এই, উই ইত্যাদি উচ্চারিত হয়ে থাকে। বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ আছে ৩৫টি। কিন্তু মুখের ভাষায় মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা ৩০টি। বাংলায় কোনো কোনো ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণচিহ্ন রয়েছে (যেমন : ই/ঈ, উ/উ, ন/ণ, শ/ষ/স)। কখনো কখনো একাধিক ধ্বনির জন্য একই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এমন ধ্বনিও আছে যার কোনো লেখ্য বর্ণচিহ্ন নেই (যেমন : ‘অ্যা’)। অনেক সময় পাশের ধ্বনির প্রভাবে একই ধ্বনির উচ্চারণ অন্যরকম হয়ে যায়। (যেমন : ‘বাঘঘাটা’র উচ্চারণ ‘বাগঘাটা’)। এছাড়া বাংলায় উচ্চারণ নির্দেশক চিহ্নের স্বল্পতার কারণেও অনেক সময় লিখিত ভাষা দেখে যথাযথ উচ্চারণ বোঝা যায় না।

লেখক : বিশিষ্ট বানান বিশেষজ্ঞ এবং অধ্যাপক- বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এই পাহাড়ের পাখি ও ফুলেরা

ওমর কায়সার

এম এ পরীক্ষা দেওয়ার আগে আমাকে দিনকয়েক হোস্টেলে থাকতে হয়েছিল। বন্ধু কিশোরই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল তার কুমি। সে পড়ার সময় ক্যাসেট বাজিয়ে আবৃত্তি শুনত। কম ভল্যমে আবৃত্তি চলতো আর সে পড়তো। দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। বললাম, তুই পড়বি, না আবৃত্তি শুনবি? তার উত্তর- দেখ, এই অসাধারণ আবৃত্তি ক্ষমের মধ্যে একটি শৈল্পিক আবহ তৈরি করছে। তাতে আমার মন প্রশান্ত হচ্ছে। পড়ালেখাও ভাল হচ্ছে।

পাহাড় বেষ্টিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধ্যার ক্যাম্পাসকে ঘিরে ধরতো এক আশ্চর্য নীরবতা। আর সেই নীরবতার ভেতর মাঝে মাঝে মৃদু বেজে উঠত শস্ত্র মিত্রের গলায় জীবনানন্দ দাশের ‘শিকার’ কবিতাটি।

সারাবাত চিতা বাধিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সুন্দরীর বন থেকে অর্জনের বনে ঘুরে ঘুরে এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে।

শুনতে শুনতে আমি চারপাশের জগত থেকে অন্য কোথাও চলে যেতাম। তাড়া খাওয়া হরিণের সাথে সাথে আমিও যেন হারিয়ে যেতাম এক গভীরতর অরণ্যে। দীর্ঘ রাত্রির ক্লান্তি ছাপিয়ে যখন দেখতাম ‘সুন্দর বাদামী হরিণ’ পৌছত ভোরের কাছাকাছি তখন আমার নিজের রক্ত-প্রাবাহের মধ্যে যেন প্রশান্তি অনুভব করতাম। মগজের অঙ্ককারে খেলা করতো ভোরের নতুন প্রভা। শরীরের প্রতিটি রোমকূপে এক মনোরম পুলক যেন নেচে বেড়াত। কেন না তখনতো ‘ভোর’। ‘ভোর’ এই শব্দটি দিয়েই কবিতার শুরু। ভোর আসে এইভাবে - ‘আকাশে একটি তারা এখনো জুলছে। পাড়াগাঁৰ বাসর ঘরের সবচেয়ে গোধুলী মদির মেয়েটির মতো।

কবিতার শুরুর দিকের এই লাইনটি আবৃত্তিকার এমন করে আবৃত্তি করতেন, আমার চোখের সামনে এক লজ্জাবন্ত ‘শ্যামল রঙ রমণী’ কেন জানি চোখের জল ফেলত। তারপর মুহূর্তে যেন কোনো এক আশ্চর্য অলৌকিক যানবাহন আমাকে নিয়ে যেত বহু বহু কাল আগে। হাজার বছর আগে মিশরের রানির মদির চোখের সামনে। জীবনানন্দ দাশের চিরপময় এই কবিতাটির প্রতিটি দৃশ্য চলচিত্রের মতো শস্ত্র মিত্র অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে যেন আমার সামনে প্রদর্শন করতেন। এই আবৃত্তি আমি শুনতাম না। দেখতাম। ময়ুরের পাখার মতো আশ্চর্য সকাল। নদীতে নেমে হরিণের স্নান। সেই বিধৃংসী অদ্ভুত শব্দ। মচকা ফুলের মতো লাল জল, এইসব দৃশ্য পরম্পরা, এই করুণ ঘটনা যেন আমার সামনে ঘটছে। আর এই ঘটনা দেখে আমি হতবিহুল হয়ে থাকতাম অনেকক্ষণ। কবিতাটি আগে বইতে পড়েছি। কিন্তু এই যে বললাম দৃশ্যগুলো নিজের সামনে

দেখলাম এবং কবিতাটিক নতুন করে আবিষ্কার করলাম, তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র শস্ত্রমিত্রের স্বরের যাদুর কল্যাণে, শৈলিক উপস্থাপনায়। এক নতুন মাত্রায় তিনি কবিতাকে পৌছে দিলেন। এটাই শিল্পীর কাজ।

কবিতাকে অনুধাবন করে, তার গভীরে চুকে শ্রোতার মর্মে পৌছে দেয়াই হয়তো আবৃত্তিকারের কাজ। আবৃত্তিকার নতুন উপলব্ধি সঞ্চারণের সেতু হয়ে দাঁড়ান পাঠক ও কবিতার মাঝামাঝি। তাই কবিতা যিনি আবৃত্তি করবেন তার দায়িত্ব অনেক। তাকে আয়ত্তে আনতে হবে অনেক কিছু। কবিতার মূল অর্থ বা ভাব রক্ষিত না হলে ঘটতে পারে বিপর্যয়। পাঠক প্রতিরিত হতে পারেন আবৃত্তিকারের দ্বারা। কেবল শুন্দ উচ্চারণ নয়, ছন্দ মাত্রা চিত্রিক্ষণ এ বিশ্বায়গুলোর মর্মোন্দারেরও ব্যাপার আছে। শব্দকে তখনই ছবি করে তোলা সম্ভব যখন পুরো কবিতাটাই আবৃত্তিকারের কাছে ধরা দেবে। কেবল কঠে নয়, দ্বদ্যে ও মনে কবিতাকে আগ্রহ করতে হবে।

কবিতার যে সংগীতময়তা আছে নজর রাখতে হবে সেই দিকেও। আবৃত্তির সময় অভিনয়ও অনিবার্য হয়ে উঠেও অতিনাটকীয়তা ক্ষতিকর। তাতে কবিতার মূল সুর ব্যাহত হয়। অনেকে শিল্পাধ্যমের সমন্বয় ঘটিয়ে আবৃত্তি শিল্প তার সৌন্দর্যের শীর্ষে পৌছতে পারে। আবৃত্তিকারকে কবিতার রহস্যময়তাকে ছুঁতে হয়। কবিতা নিজেই শুন্দতম শিল্পের এক প্রকৃতি উদাহরণ। তো এই শিল্পকে নিয়ে আবৃত্তিকার নতুন এক শিল্পের জন্ম দেন। তাই ভুল উপস্থাপনার কারণে কবিতার মূল রস আস্থাদনে শ্রোতারা যেন বিভ্রান্ত না হন। অনেকেই যেমন আজকাল বৃন্দ আবৃত্তি করে থাকেন। করণ রসের একটি কবিতাকে দেখি নামতার মতো নাচতে নাচতে আবৃত্তি করে যাচ্ছেন একদল অবুবা তরুণ তরুণী। তখন তাকে আবৃত্তিতে মনেই হয় না বরং কবিতার স্বাদ নষ্ট করার অপরাধে তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে ইচ্ছা করে।

তবে তরুণ আবৃত্তি শিল্পীর ইন্দীনীঁ এই শিল্পাধ্যমের জন্য প্রয়োজনীয় সব নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে সাধনা করে যাচ্ছেন। চট্টগ্রামে আমার বেশ কয়েকজন প্রিয় আবৃত্তিকার রয়েছেন।

ভোগবাদী এই বিশ্বে পুঁজির পেছনে ছুটতে ছুটতে, লাভ লোকসানের হিসাব কসতে কসতে যখন মানুষের নাড়িয়াস উঠছে, তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতা পাগল কিছু তরুণ ‘আবৃত্তি মঞ্চে’র ছায়ায় এসে শিল্প সাধনা করছে। এটি ভাবতে আমার ভাল লাগে। তাদের প্রতি নিজের অজাতে আমার শ্রদ্ধা আসে। তাই প্রতি বছর যখন তারা কবিতা পড়তে ডাকেন তখনই চলে আসি শস্ত্র মিত্রের সেই শৃঙ্খল ক্যাম্পাসে। এই ক্যাম্পাসকে প্রকৃতি অকৃপণভাবে সাজিয়েছে। চারদিকে সবুজের অপার বিস্তার, এত শোভা যেন কবিতার জন্য একটি দুর্লভ ক্যানভাস অন্যায়ে তৈরি হয়ে আছে। এখানেই তো কবিতা মানায়। তাই আবৃত্তি মঞ্চের বন্ধুরা যখন কবিতা আবৃত্তি করে আমার মনে হয়, ওরা এই পাহাড়ের পাখির মতো, ফুলের মতো। গাইছে আর সৌরভ ছড়াচ্ছে।

লেখক : কবি ও সাংবাদিক।

ଆବୃତ୍ତି

କାମରଳ ହାସାନ ବାଦଳ

'ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ, ଭାବ, ଭାଷା ପ୍ରଭୃତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ ପାଠ' ଅଭିଧାନେ ଆବୃତ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଦେଯା ଆଛେ ଏଭାବେଇ । ଆମାର ମନେ ହୁଣ ସଂଜ୍ଞା ଥେକେଇ ଏ ଶିଳ୍ପେର ପ୍ରାଚୀନତ୍ବ କିଛୁଟା ହଲେଓ ଅନୁଧାବନ କରା ଯାଇ । ତାର ମାନେ 'ଭାବ ବିନିମୟ' ଥେକେ ମାନୁଷ ସଥିନ ଭାଷା ଆବିକ୍ଷାର ବା ଆୟତ୍ତ କରେଛେ ଆର ସେ ଭାଷାକେ ଗୁଛିଯେ ଓ ସୁଲଲିତ କଟେ ବଲବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକେ ଆବୃତ୍ତିର ଜନ୍ମକ୍ଷଣ ବଲା ଯେତେ ପାରେ । ହାଜାର ହାଜାର ବହର ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବାଣୀ ବା ଉପଦେଶାବଳୀ ମାନୁଷ କଟେ ଧାରଣ କରେ ଛାଡ଼ିଯେ ଦିଯେଇ ପ୍ରଥମ ଥେକେ ପ୍ରଜନ୍ମର ମାଝେ । ଧର୍ମୀୟ ଶ୍ଲୋକ କିଂବା କାହିନୀ ପାଠ ଯାଁରା କରତେ ତାରୀଓ ଓ ତାନ୍ଦେର କର୍ତ୍ତ ବା ପାଠେର ମାଧ୍ୟମେ ଆକୃଷ କରତେ ଶ୍ରୋତାଦେର । ଆଜ ଥେକେ ଥାଯ ଦେଡୁ ହାଜାର ବହର ଆଗେ ଇସଲାମ ପ୍ରଚାରେର ଯୁଗେ ହ୍ୟରତ ହେଲାଲ (ରା.) ଏର ସୁଲଲିତ କର୍ତ୍ତେ ହ୍ୟରତ ମୋହମ୍ମଦ (ସ.) ଓ ଅନ୍ୟଦେର ମୋହିତ କରେଛିଲ ବଲେଇ ତିନି ହ୍ୟେ ଉଠେଛିଲେନ ତତ୍କାଳେ ବିଶେଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ-ମୁହାଜିନ ।

ଏସବ କଥା ବଲେ ଆମି ଆସଲେ ବୁଝାତେ ଚେଯେଛି ଯେ, ବାକ ଶିଳ୍ପ ବା ଆବୃତ୍ତି କଟଟା ପ୍ରାଚୀନ ଏକଟି ଶିଳ୍ପମାଧ୍ୟମ । ଏଥନ ଏ ଶିଳ୍ପେର ଚଢ଼ାନ୍ତ ଏକଟି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଛେ । ଆବୃତ୍ତି ହ୍ୟେ ଉଠେଛେ ସମନ୍ତ ଶିଳ୍ପେର ଏକଟି ଅନିବାର୍ୟ ଅନୁସଙ୍ଗ । ସେ ସାଥେ ଜନପ୍ରିୟ ତୋ ବଟେଇ ।

ଆବୃତ୍ତି ବଲତେ ଏକଟି ସମୟେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର କବିତା ଆବୃତ୍ତିକେଇ ବୋବାନୋ ହତୋ । କିନ୍ତୁ ଏଥନ ଏ ଶିଳ୍ପେର ବ୍ୟଥି, ବିସ୍ତ୍ରତି ଓ ବିଷୟ ସମ୍ପ୍ରଦାସରଣଶିଳୀ । ଆବୃତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଆର କବିତା ଥାକଛେ ନା । ଯେ କୋନ ବିଷୟକେ ଶିଳ୍ପମମ୍ଭତାବେ ଉପତ୍ଥାପନେର ମାଧ୍ୟମେ ଆବୃତ୍ତି ହ୍ୟେ ଉଠେଛେ ବିସ୍ତ୍ରତ ବାକଶିଳ୍ପ । ଯଦିଓ କବିତାଇ ଏଥନୋ ଆବୃତ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଓ ଜନପ୍ରିୟତମ ବିଷୟ ।

ଆମାର କବିବନ୍ଦୁରା କ୍ଷେପେ ଯାବେନ କିନା ଜାନି ନା ତବେ ଆମି ବିଶ୍ୱାସ କରି କବି ଓ କବିତାକେ ପରିଚିତ ଓ ଜନପ୍ରିୟ କରତେ ଏକଜନ ଆବୃତ୍ତିଶିଳ୍ପୀର ଭୂମିକା ଅନୟୀକାର୍ୟ । ପୃଥିବୀତେ କୋନ କାଳେଇ କବିତାର ବେଶ ପାଠକ ଛିଲ ନା । ବାଂଲାଦେଶ ଓ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଯ । କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳ୍ୟରେ ଏକଜନ ଶିକ୍ଷିତ ତରଣ ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ମାଠେର ଏକଜନ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତାର କାହେ କବି ଓ କବିତାକେ ନିଯେ ଯାନ ଆବୃତ୍ତିଶିଳ୍ପୀରାଇ । ଆମାଦେର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଥେକେ ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ, ସୈରାଚାରବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗ୍ରାମେ କବିତା ଯେ ଜାଗରଣେର ଭୂମିକା ରେଖେଛିଲୋ ତା ସମ୍ଭବ ହେଲିଛିଲୋ ସେ ସବ ବିଷ୍ୟାତ କବିତା ଯଥାର୍ଥ କଟେ-ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲିଛିଲୋ ବଲେ । କବି ହେଲାଲ ହାକିମ ଏଥନୋ ବେଁଚେ ଆଛେ ଶ୍ରୋତାଦେର ମାଝେ ଆବୃତ୍ତିଶିଳ୍ପୀଦେର କାରଣେଇ । ଯଦିଓ କିଛୁ କିଛୁ ବିଷୟେ କବିଦେର କିନ୍ତୁ ଆପନ୍ତି ଥେକେ ଯାଇ । ଆମାର ଏକଟି ଅଭିଭତ୍ତାର କଥା ବଲି-ଆମାର ଏକ କବି

ବନ୍ଦୁର ଉପରୁତ୍ତିତେ ତାର କବିତା ଆବୃତ୍ତି ହିଛିଲୋ । ଏକଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ତିନି ଆପନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରଲେନ ଯେ ଏ ସ୍ଥାନେ ତିନି ଏମନ କରେ ବୋବାତେ ଚାନନ୍ଦ, ଆବୃତ୍ତିକାର କବିତାର ଭାବ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଧାବନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଯେଛେ । ଏମନ କଥା ଅନେକେଇ ହ୍ୟତ ବଲେ ଥାକବେନ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲତେ ହେବେ ଏମନ ସଟନା ଖୁବ ବେଶ ନଯ । ବରଂ ଆମାଦେର ଅଧିକାଂଶ କବିରା ସଥିନ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣେ କାରଣେ ଶ୍ରୋତା ଆକୃଷ କରତେ ବ୍ୟର୍ଥ ହନ ତଥିନ ଆବୃତ୍ତିଶିଳ୍ପେର ପ୍ରାଯୋଜନୀୟତା ତୀବ୍ରଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେଯ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ କବିରା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁଳତେ ପାରେନ କବିତା କି ଶୁଧୁ ଆବୃତ୍ତିର ଜନ୍ୟେ? କବିତା ତୋ ନିର୍ଜନତା ଓ ଏକାକିତ୍ତର, ଅନୁଭବ ଓ ଏକାନ୍ତ ପାଠେର । ଅସ୍ମୀକାର କରି ନା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ହଲୋ ଶିଳ୍ପ ତୋ ମାନୁଷେର ଜନ୍ୟେ, ନା କି? ଅଭିଯୋଗ ଆଛେ ଆବୃତ୍ତିଶିଳ୍ପୀର ଜନପ୍ରିୟ ହୋଇବା ଜନ୍ୟେ ଜନପ୍ରିୟ ଓ ଶ୍ଲୋଗନଧର୍ମୀ କବିତାଗୁଲିହି ନିର୍ବାଚିତ କରେନ ବେଶ । ଅଭିଯୋଗ ସତି ମାନତେଇ ହେ ତବେ ସବ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ନଯ, ଆମାଦେର ଅନେକ ଅହାଜ ଆବୃତ୍ତିଶିଳ୍ପୀଗଣ ରବିନ୍ଦ୍ର, ନଜରଳ, ଜୀବନାନଦୀର କବିତା ନିର୍ବାଚିତ କରତେନ ଯା ଶୁନେ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରା ଯେତୋ ନା । ବର୍ତ୍ତମାନେର ନବୀନ ଆବୃତ୍ତିକାରଗଣ ଏ ଅଭିଯୋଗେର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନ ଆଶା କରି ।

ଆମି ଏଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯା ଭାବି ତା ହଲୋ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବୃତ୍ତିଶିଳ୍ପୀର କବିଦେର ଅପକାରେର ଚେଯେ ଉପକାରଇ କରେନ ବେଶ । ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ କବିଦେର ସାଥେ ଆବୃତ୍ତିଶିଳ୍ପେର ସଂଘାତ ନଯ, ସହାବସ୍ଥାନଇ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ । ଆଶା କରି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଚିରକାଳୀନ ଓ ଚିରସଖ୍ୟତାର ।

ଲେଖକ : କବି ଓ ସଂଗ୍ରଠକ ।

শুধু কবিতা পড়া নয়, আবৃত্তিকার হওয়া

ইন্দিরা চৌধুরী

কবিতার বাচিক উচ্চারণে শিল্পসমত প্রকাশই আবৃত্তি, অন্যান্য শিল্পের মতো আবৃত্তি একটি শিল্প- এ শিল্প সৃষ্টি করেন আবৃত্তিকার। তার নিজস্ব বোধ দিয়ে। অর্থাৎ আবৃত্তিশিল্পী কবিতাকে শিল্প রূপের মাধ্যমে কাঠামো নির্মাণ করে শ্রোতার মনে ছন্দের দোলা দেন। বোধসম্পন্ন, মস্তুল, সুন্দর কণ্ঠশেলী, বাচনভঙ্গী ও শুন্দ উচ্চারণে শ্রোতার মনকে আকৃষ্ট করেন যিনি, তিনি আবৃত্তিশিল্পী তথা আবৃত্তিকার।

সংগীত, নৃত্য এবং অন্যান্য কলার মত আবৃত্তি মানুষের কাছে এমন একটা জায়গা করে নিয়েছে যে এবারে শিল্পটি নিয়ে ভাবার প্রয়োজন এসে পড়েছে। আবৃত্তি এখন শোনাবার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে। তৈরি করে নিয়েছে নিজগুণে মানুষের শ্রুতি, বর্তমানে বাংলাদেশে আবৃত্তিকারের সংখ্যা নেহাঁৎ কম নয়।

কবি কবিতা লেখেন নিজস্ব আবেগ থেকে। আবৃত্তিকার তার ভাবের সাথে মিতালী করেন এবং কঠের সুমধুর লালিত্যে যতরকম রস আছে অর্থাৎ শুন্দ উচ্চারণ, বাচনভঙ্গী, ছন্দ, স্বর প্রক্ষেপণ, কণ্ঠশেলী ইত্যাদি দিয়ে ভাবের সাথে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন।

বন্ধুত্বের হাত বাড়ানেই যে কবিতা শ্রোতা ও আবৃত্তিকারের সাথে বন্ধুত্ব তৈরী করতে পারবে তা কিন্তু নয়। আবৃত্তিচর্চার পরিধি বেড়েছে, শিক্ষার্থীও আশার চাইতে অধিক। এর প্রেক্ষিতে অনেকেই এই বিষয়ে মোটামুটি বুঝতে শিখেছেন এবং ভেবে নিচেন আবৃত্তিচর্চায় এলেই কঠের বাহাদুরিটা মোটামুটি দেখানো যাবে। অনেক কর্মশালা, অনেক প্রতিযোগিতা, অনেক প্রশিক্ষণ সভ্রেও কোথায় যেন সুরের ছন্দপতন ঘটেছে। অর্থাৎ এত পরিশ্রম সভ্রেও আবৃত্তির ক্ষেত্রে যা হবার আশা ছিল তা ঠিক ঠিক হচ্ছে না। আঞ্চলিকতা একটা বিরাট দোষ। সব শিল্প সাধনায় এটি একটি প্রতিবন্ধক, এটিকে শুন্দ করতে গিয়ে অধিকার্শ শিক্ষার্থী শুন্দ উচ্চারণের সাধনায় নিজেকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যে, আবৃত্তি করতে গেলে আরও যে বিয়য় আসার প্রয়োজন হয় তা একেবারেই মাথার বাইরে রাখেন। আঞ্চলিক উচ্চারণের কিছু সুর ও বোঁক রয়েছে। সেটি কাটাতে হয় শিশুকালে, বড় হয়ে সেটি কাটানো খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে কোনো কোনো সময়। কিন্তু থেমে থাকলে তো চলবে না। আবৃত্তি করার ইচ্ছে থাকলে এটি যেমন কাটানো জরুরি। তেমনি জরুরি অন্য বিষয়গুলোকে নজরে রাখা, মাথা থেকে ঝোড়ে না ফেলা।

আর বোধের জায়গাটা ভাবার অবকাশই হয় না কারো কারো। কঠ ভরাট করার

প্রক্রিয়ায় এতো বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে বোধ এখন ত্রিসীমানার ভিতর প্রবেশ করতে কুষ্ঠাবোধ করে।

তবে কঠ আবৃত্তির জন্যে একেবারেই যে কিছু নয় তা বলা সমীচীন হবে না। শ্রোতারাও তা অবহেলায় রাখেন না। তবে আঞ্চলিকতা, বোধ এগুলোকে এড়িয়ে শুধু কঠের দিকে খেয়াল রাখা একেবারেই কি অপ্রাসঙ্গিক নয়?

আবৃত্তিকারকে যে কথাটা ভুলে গেলে চলবে না- আবৃত্তি শুধু কঠনির্ভর, উচ্চারণ সর্বস্ব হতে পারে না। আবৃত্তিকারের এটি মনে করা কখনো উচিত হবে না যে, আমার কঠ আছে, তাতে বোধ আবেগ এগুলো সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে উৎরানো যাবে-এটি একটি মারাত্মক ভুল চিন্তা, কারণ বোদ্ধা শ্রোতা এখনও বর্তমান।

এভাবে ভাবলে যা হবে তা হলো অবুরু আবৃত্তিকারের কঠে কবিতাটি তার নিজস্বতা হারাবে। আবৃত্তিকার যা বলতে চাইছে তা পরিষ্কার হবে না। পরিশেষে কবিতার ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশিত হবে কৌশলী উচ্চারণে।

শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত ইত্যাদি বিষয়ের ধারণা আবৃত্তিকারের স্পষ্টভাবে জানা না থাকলে কবির আবেগ প্রসূত সৃষ্টি কবিতা আবৃত্তিকারের ভারী গলায় পিষ্ট হয়ে কোনো কোনো কবিতাংশ দলিত মথিত হতে পারে।

সংগীতের সাথে কবিতার সম্পর্ক অনেক পুরানো। অবশ্যই কবিতা আবৃত্তির সময় কথা থেকে সুরের প্রাধান্য বেশি হলে সেটি গীতি কবিতা হয়ে যায় এবং অতি আবেগে কবিতা পড়তে গিয়ে আবৃত্তিকার গান গাইতে শুরু করেন।

আবার নাটক আবৃত্তির একটা অংশ বটে। কিন্তু আবৃত্তি কোন নাটক নয়। তাই নাটকীয়তাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়া ঠিক নয়।

অর্থাৎ কবিতা আবৃত্তি করতে গিয়ে অনেকেই সুর, আরোপিত উচ্চারণ, নাটকীয়তা, তারীগলা, অকারণে গলাকে না বুঝে তার স্বর ও নীচুস্বরে ওঠা- নয়া, অবগরণে, স্বরাঘাত, শ্বাসাঘাত, আবহসংগীত অনর্থক আলো ব্যবহার করেন। এসবের অতিরিক্ত উপস্থিতি অবশ্যই উচিত নয়।

যিনি আবৃত্তি করবেন বলে ভাবছেন তাকে পরিপূর্ণ তৈরি হবার অংশে মঞ্চে ওঠার প্রবণতা ত্যাগ করা উচিত। অস্থিরতা বড় রোগ, তৈরি না হয়ে মাইক্রোফোনে নিজেকে জাহির করার জন্য দ্রুত আবৃত্তিকার হবার প্রত্যাশায় যেন তেন প্রকারে আবৃত্তি করার মিথ্যা প্রয়াস বড় আবৃত্তিকার হবার আকাঙ্ক্ষাকে খুন করে। অনেকটা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার মতো। আমি কবিতা পড়তে পারি। আমার কঠ ভরাট, সাউন্ড সিস্টেম ডেলিভারি ভালো। ইকোটা বাড়ালে কঠ মধুর শোনাবে, ইত্যাদি সবকিছু মাথায় নিয়ে আবৃত্তিকার হবার বাসনা না থাকাই ভালো।

আবৃত্তিকারের থাকতে হবে কনসেন্ট্রেশন, কঠের নমনীয়তা ও একনিষ্ঠ মন, আবৃত্তি

করার জন্য ভাবতে হবে। কবিতা পড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তির মনের ভাবগুলো বলে প্রকাশ করার জন্য মন কেমন করে কিনা, একটা বিষয়ে সবসময় আভ্যন্তরোগ করে কিনা, এবং যা করতে চাওয়া হচ্ছে সেটি তাকে এমন কিছু দেয় কিনা যা তার কাছে অনেক মূল্যবান, সাধনা করার মানসিকতা আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে আবৃত্তি নিয়ে ভাববার বিষয়টি অনধিকার চর্চা হতে পারে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা – এমন অনেকে আছেন যারা আবৃত্তির ধারক ও বাহক বনে গেছেন কিন্তু তারা জীবনে একটা কবিতা পড়েছেন কিনা সন্দেহ। যারা আমার উপরিউক্ত বক্তব্যের কোনটার সাথে যায় না। এরকম আরো অনেক যৌক্তিক জায়গা অযৌক্তিক লোকের পদচারণায় মুখ্য। তাদের থেকে দূরে থাকা বাস্তুনৈয়। তাতে সাধনায় সুবিধা হয়।

স্বভাবসুলভভাবে স্বধর্ম রক্ষার্থে চাই বিষয়ভিত্তিক কবিতা নির্বাচন, যেটা জরুরি। নইলে নিজের বিপদ যেমন তেমনি অন্যদের মহাবিপদ। যারা কবিতা নির্বাচনে পিছিয়ে, যাদের বোধের বোধোদয় হয় না। সেই শ্রেণীর লোকদের দৌড়ও হবে অনুষ্ঠান, টিভি, রেডিও বড়জোর ক্যাসেট বের করা পর্যন্ত। এখানে আশ্চর্যের কিছু নেই। দেশজুড়ে অযোগ্য লোকের পদচারণা বেড়ে গেছে।

যিনি সত্যিকারভাবে কবিতা আবৃত্তি করেন, তার সাথে কবিতার লাগোয়া অনেক দিনের। পড়তে পড়তে তার বোধ তৈরি হয়। বোধ কর্তৃর উপস্থাপনে সম্মত হয়।

একজন সফল আবৃত্তি শিল্পী তখনই শ্রেতা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবেন যখন তিনি শিল্প নির্মাণের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম কৌশল রপ্ত করে বিষয়বস্তুকে প্রকাশের মাধ্যমে শ্রেতাদের অন্তরে দেলা লাগাতে সক্ষম হবেন, যখন শ্রেতা দর্শকরা আবৃত্তিকারের আবৃত্তি শুনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, আলোচিত হন তখনই বুবাতে হবে আবৃত্তিকার তার উপস্থাপনায় সফল।

আবৃত্তির অভিযন্তি উপস্থাপনের ব্যঙ্গনায় শ্রেতা দর্শকের কাছে বক্তব্যের গভীরতা পৌছে দিতে সহায়তা করে। এমন কোন ভাব প্রকাশ যেন না হয়, যা শ্রেতাদের বিরক্তির কারণ হবে।

উপসংহারে যে কথাটি এক কথায় বলা যায়, বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে সুবিন্দ্যাসের দ্বারা কবি, আবৃত্তিকার ও শ্রেতার মধ্যে ত্রিমুখী সেতুবন্ধন সৃষ্টি করাই আবৃত্তিকারের প্রথম ও প্রধান কাজ। ধ্বনি ও শৃঙ্খল মেলবন্ধন তৈরি করার বিশাল দায়িত্বের ভার আবৃত্তি শিল্পীর তথা আবৃত্তিকারের।

লেখক : আবৃত্তিশিল্পী

অফুরন্ত সন্তাননা আছে আবৃত্তির

রাশেদ হাসান

অনেকে বলেন একসময় আবৃত্তির জোয়ার ছিল, কিন্তু এখন ভাট্টার সময়। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। কবিতাকে ভালোবাসে আবৃত্তিকে ভালোবাসে সারাদেশে অসংখ্য ছেলেমেয়ে কাজ করে যাচ্ছে এখন। বহু সন্তাননাময় সংগঠন গড়ে উঠেছে সাম্প্রতিক সময়ে। বহু কর্মশালা পরিচালিত হচ্ছে। বাচনিক উৎকর্ষের জন্য, প্রমিত বাংলা উচ্চারণে দক্ষতা তৈরির জন্য আবৃত্তি সংগঠনগুলো বিভিন্ন রকম আয়োজন করে যাচ্ছে। আজকের দিনে যেখানে স্বপ্ন দেখতেই ভুলে যাচ্ছে মানুষ, সেখানে কিছু মানুষ এখনও হাতে হাত ধরে এক সাথে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ছে। চারিদিকে নানামুখী ক্ষয়-অবক্ষয়, হতাশা, বিবিমিশার বিপরীতে আবৃত্তির এ দৃশ্য আমাদের প্রবলভাবে আশান্বিত করে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা প্রবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে আবৃত্তি শিল্পমাধ্যমটি একটি শক্ত জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। আবৃত্তি শিল্পটি একক চর্চার বিষয় হলেও আমাদের দেশে এই শিল্প মাধ্যমটি বিকশিত হয়েছে সাংগঠনিক চর্চার ভেতর দিয়ে। বর্তমানে প্রথিতযশা আবৃত্তিশিল্পীদের মধ্যে দুই এক জন ছাড়া অন্যরা সকলেই বেরিয়ে এসেছেন সাংগঠনিক চর্চার মধ্য দিয়ে। আবৃত্তিশিল্পীরা শুধু আবৃত্তিচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। আবৃত্তি সংগঠনগুলো শিল্পচর্চার পাশাপাশি রাষ্ট্রের যেকোন সংকটময় মুহূর্তে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। সত্যিকার অর্থে শিল্পী তো সে-ই, যার শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতার পাশাপাশি মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি, ইতিহাসের প্রতি, মাটির প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় আবৃত্তিশিল্পীরা ট্রাকে-বিকল্পমধ্যে আবৃত্তি করে গণজাগরণের সৃষ্টি করেছেন। দর্শনীর বিনিময়ে এখন নিয়মিত আবৃত্তির অনুষ্ঠান হচ্ছে সারাদেশে।

বর্তমানে দু'একটি বেসরকারি রেডিও চ্যানেল বাংলা ভাষা নিয়ে যেভাবে বিকৃতির উৎসবে মেতেছে তাতে নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। তাদের কাছে মনে হতে পারে বিকৃতভাবে কথা বলতে পারাটাই বোধহয় আধুনিকতা। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রতিটি ভাষারই একটা নিজস্ব গতি আছে, সৌন্দর্য আছে, শৃঙ্খলা আছে। ইংরেজি ভাষা যেরকম একটু দ্রুত লয়ে চলে সে রকম বাংলা ভাষা চলে না। ইংরেজি ভাষার চাকার উপর বাংলা ভাষা চাপিয়ে দিলেই তা ফ্যাশন হয়ে যায় না। এতে ভাষা তার নিজস্বতা হারায়। এক্ষেত্রে আবৃত্তি সংগঠনগুলো সোচার ভূমিকা পালন করতে পারে। আবৃত্তি নিয়ে নানা নিরীক্ষা ও নতুন ধারণার প্রয়োগ হয়েছে। একসময় সম্মিলিতভাবে আবৃত্তি বা বৃন্দাবৃত্তি করা মনেই ছিল – কিছু কবিতার কোলাজ, বিভিন্ন ছন্দে, স্বরের

উঠানামার মাধ্যমে আবৃত্তি করে যাওয়া । এখন নতুন করে পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনার ধরন তৈরি হয়েছে আবৃত্তিতে । এখন লাইট, কস্টিউম, প্রজেক্টর, করিওগাফির ব্যবহার হচ্ছে । পঞ্চাশ, ষাটের দশকে একক আবৃত্তি যেভাবে পরিবেশন করা হত এখন আর সেভাবে করা হয় না । স্বরে ও বাচনে এসেছে ভিন্নতা । প্রচুর আবৃত্তির ক্যাসেটও বের হচ্ছে প্রতি বছর । প্রথম দিকে আবৃত্তি ছিল অন্যকেন অনুষ্ঠানের ক্ষুদ্রতম একটি অংশ মাত্র । আজ আবৃত্তি স্বমহিমায় পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে । আবৃত্তির শিল্পের সমন্বিত ধরন এ থেকেই বোৰা যায় ।

এতসব অর্জনের পরে বলতে হয় আবৃত্তি দলগুলো অতি মাত্রায় কর্মশালা নির্ভর হয়ে পড়েছে ইন্দীনাং । মানসম্পন্ন প্রযোজনা নিয়মিতভাবে মঞ্চে দেখা যাচ্ছে না । নতুন আবৃত্তিকারও সেভাবে উঠে আসছে না । নতুন আবৃত্তিকৌদের নিয়ে নির্মিত অনুষ্ঠানে সকল দলের সদস্যদের উপস্থিতি সেভাবে দেখা যায় না । দলগুলোর নেতৃত্ব পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকলেও কর্মী পর্যায়ে যোগাযোগ তেমনভাবে গড়ে উঠেনি । কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দৰ্শনের কারণে দল ভেঙেছে বারবার । ক্ষণিক্ত হয়েছে সামগ্রিক আবৃত্তি অঙ্গম ।

এ অবস্থায় আবৃত্তি সংগঠনগুলোকে আরও পরিচালিত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে । এখানে বলা দরকার, সমকালে বিভিন্ন আবৃত্তি সংগঠনের কর্মশালায় যারা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে আসেন, তাদের অধিকার্হণেরই মনোবাসনা এই, কর্মশালা শেষেই তারা আবৃত্তির কলা-কৌশল, উপস্থাপনা আয়ত্ত করে ফেলবে । দু'-চার মাসের একটি কর্মশালাই একজনকে আবৃত্তিকার কিংবা উপস্থাপক বানিয়ে দেবে এ ধারণায় যে সমস্ত প্রশিক্ষণার্থী আস্থাশীল তাদেরকে স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণা সহ্যের প্রস্তুতি থাকা বাঞ্ছনীয় । আবৃত্তি একটি সূক্ষ্ম শিল্প-মাধ্যম । এটি একটি বহুমান ধারা । এটিকে ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়, পরিশীলিত চর্চার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে হয় । এ চর্চায় ছেদ পড়লেই স্থবিরতা-জড়তা ব্যস্ত গড়ে ।

নিয়মিত অনুশীলন, প্রয়োগ এবং উপস্থাপন হতে পারে নতুন আবৃত্তিশিল্পী তৈরির প্রাথমিক প্রক্রিয়া । সন্তানাময় শিল্পীদের চর্চার ক্ষেত্র উন্নত করতে হবে । দর্শক সম্পৃক্ততার জন্য সমকালীন শিল্পৱৰ্চি এবং সামাজিক সংকটকে ভিত্তি করে আবৃত্তি প্রযোজনা নির্মাণের দিকে নজর দিতে হবে । প্রযোজনা নির্মাণে নিরীক্ষার মানসিকতা থাকা চাই সংগঠনগুলোর । দলীয় অবকাঠামোতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পরিহার করে কর্মীদের নিয়ে সমিলিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা জরুরি । কেননা অফুরন্ত সন্তানাময় শিল্প হিসেবে আবৃত্তি আজ স্বীকৃত স্বতন্ত্র মাধ্যম ।

লেখক : আবৃত্তিকার ও সংগঠক

আবৃত্তি : কবিতা নির্বাচন ও নির্মাণ প্রসঙ্গ

ফারুক তাহের

আবৃত্তি শিল্পে দক্ষ ও পরিণত শিল্পী হয়ে উঠতে গেলে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়াদির সাথে কবিতার যথার্থ নির্বাচন ও এর নির্মাণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি । অনুষ্ঠান বা মঞ্চের উদ্দেশ্য'র সাথে আবৃত্তিকারের নির্বাচিত কবিতা যথাযথ হয়ে না ওঠলে, তা বেমানান ও বেখাঙ্গা ঠেকবে বৈকি ! নির্মাণ দক্ষতা ও কঠরে কারুকাজ দিয়ে অনুষ্ঠানের সাথে যায় না-এমন কোন কবিতা আবৃত্তি করে একজন শিল্পী তাৎক্ষণিকভাবে উৎরিয়ে গেলেও সচেতন শ্রোতার কাছে তা প্রশ়্নবিদ্ধ হয়ে উঠবে । একজন শ্রোতা হিসেবে যতটুকু স্বাদাস্বাদন করবার কথা ছিল, এ থেকে তিনি তা পেতে পারেন না । প্রকৃতির দিকে তাকালেও আমরা এর ভুরি ভুরি প্রমাণ দেখতে পাই । ধৰন, একজন রসনা বিলাসীর কাছে বর্ষা মৌসুমের ইলিশ যতটুকু স্বাদের হয়ে ধরা দেয়, শীত বা গ্রীষ্মকালীন ইলিশ ততটুকু স্বাদের ঠেকে না । একইভাবে শীতকালীন কোন সবজি হাইব্রিডের কল্যাণে বা অন্য কোনভাবে গ্রীষ্মকালেও আপনি পেতে পারেন; কিন্তু স্বাদের দিক থেকে তা কি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে?

একজন আবৃত্তিকার এ শিল্পে যতই দক্ষ ও পারঙ্গম হয়ে উঠুন না কেন, তাঁর যদি স্থান-কাল, সময় ও প্রকৃতির সাথে সম্যক ধারণা ও যথার্থ অনুভব না থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে-এ শিল্পে তাঁর পরিপূর্ণতার ঘাটতি রয়েছে ।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী ও সমালোচক উৎপল কুণ্ড তাঁর 'আবৃত্তি করার আগে' অঙ্গে বলেছেন, "গ্রীষ্মের সকালেও উজ্জ্বল আর প্রথর রোদ, শরতের সকালেও । কিন্তু রোদের রঙ, তার উত্তাপ আর বাতাসের স্পর্শ সব মিলিয়ে এই দু'টো অনুভব কি এক? ঠিক কী রকম তফাও এই দু'টো অনুভবে-এসব তো কোন শিল্পগুরুর কাছে শেখা যায় না । গ্রীষ্ম আর শরতের রোদের কথা উঠলে কল্পনায় সেই দু'টো পৃথক পৃথক অনুভব আসতে হবে তো !

হে ভৈরব, হে রূদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রংক্ষ উড়ুনি পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃপ্রিষ্ঠ তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক-
হে ভৈরব, হে রূদ্র বৈশাখ?
.....মতশ্রমে শ্বাসিছে হতাশ
রাহি রাহি দহি দহি উঞ্চ বেগে উঠিছে ঘুরিয়া,

আবৰ্ত্তিয়া তণ্পর্ণ, ঘূৰ্ণচন্দে শুণ্যে আলোড়িয়া

চূৰ্ণ রেণুৱাশ-

মতশ্রমে শ্বসিহে হতাশ॥.....

বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৱ

ভোৱ থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়-
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনেৱ ভিজে পাতায়।

বিকিবিকি কৱি কঁপিতেছে বট,

ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট-

পথেৱ দু ধাৰে, শাখে শাখে আজি পাখিৱা গায়।.....

ভোৱ থেকে আজ বাদল ছুটেছে, আয় গো আয়।

.....তপন-আতপে আতপ হয়ে উঠেছে বেলা,

খঞ্জন দুটি আলস্য ভৱে ছেড়েছে খেলা।

কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে

ভৱা জলে তোৱা ভেসে যাবি সুখে,

তিমিৰনিবিড় ঘনঘোৱ ঘুমে স্বপনপ্রায়।

আজ ভোৱ থেকে নাই গো বাদল, আয় গো আয়।

মেঘমুক্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৱ

এই দু'টো কবিতাংশ আপনমনে পড়তে বসেও দু'টো খতুৱ দু'ৱকম অনুভব যদি
পাওয়া যায়, দৃশ্যে, স্পৰ্শে-তবেই পরিবেশটা ঠিক ঠিক অনুভব কৱা যাবে।”

এদেশে সাংগঠনিক বা যুথবন্ধ আবৃত্তি চৰাব ইতিহাস বেশি দিনেৱ না হলেও ইতোমধ্যে
এৱ ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। যাৱ ফলক্ষণতিতে আবৃত্তিশলী ও কৰ্মীদেৱ একক কিংবা
যৌথ উচ্চারণে দেশে সৈৱেচার ও অৱাজকতা সৃষ্টিকৱািদেৱ ভিত কেঁপে ওঠে বাৰবাৱ।
সাংগঠনিক এই চৰাব প্ৰতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নৃতন প্ৰাণ, দেখা দিচ্ছে নৃতন স্পন্দন।
শব্দ সৈনিকদেৱ এ মিছিল দীৰ্ঘ থেকে দীৰ্ঘত হচ্ছে। কিন্তু মুশকিলেৱ ব্যাপার হচ্ছে-
এই মিছিল থেকে যে হাৱে দায়বন্ধ শিল্পী বেৱ হয়ে আসাৱ কথা, সেটা হচ্ছে না।
আৱো একটি মুশকিলেৱ বিষয় এই যে, এখানে নৃতন নৃতন কবিতাৱ নিৰ্বাচন ও নিৰ্মাণ
হচ্ছে না। নিৰ্দিষ্ট গোটা পঞ্চাশেক কবিতাই নিৰ্বাচন-পুনঃনিৰ্বাচন, নিৰ্মাণ-পুনঃনিৰ্মাণ
হচ্ছে বললে বাহুল্য হবে না। এৱ বাইৱে যে কত বিশাল কবিতাৱ ভাগ্নার পড়ে রয়েছে;
তাৱ ভেতৱেৱ প্ৰাচুৰ্যকে বেৱ কৱে আনাৱ দায়িত্বভাৱ কেউ নিচেছে না। আমৱা চেতন-

অবচেতন মনে ধৰেই নিয়েছি ‘আবৃত্তিৱ কবিতা’ মানে রবীন্দ্রনাথেৱ নিৰ্বারেৱ স্বপ্নভঙ্গ,
বাঁশিওয়ালা, পৱিচয়, অনন্ত প্ৰেম, আগ...; নজৰলেৱ বিদ্ৰোহী, সাম্যবাদ, মানুষ,
কুলি-মজুৱ, সৃষ্টি সুখেৱ উল্লাসে...; জীৱনানন্দেৱ বনলতা, নিৰ্জন স্বাক্ষৰ, আট বছৰ
আগেৱ একদিন, শঙ্খমালা...; শামসুৱ রাহমানেৱ স্বাধীনতা তুমি, তোমাকে পাওয়াৱ
জন্য হে স্বাধীনতা, দুঃখিনী বৰ্ণমালা...; নিৰ্মলেন্দু গুণেৱ স্বাধীনতা এ শব্দটি কিভাৱে
আমাদেৱ হলো, আফ্ৰিকা, আসাদেৱ শার্ট...; বংশ্বেৱ বাতাসে লাশেৱ গন্ধ, ফাঁসিৱ
মঞ্চ থেকে...; হেলাল হাফিজেৱ ফেরিঅলা, নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়...ইত্যাদি। এৱ বাইৱে
ওপাৱ বাল্লার অৱৰ্ণ মিত্ৰ, অমিয় চক্ৰবৰ্তী, তাৱাপদ রায়, সুভাস মুখোপাধ্যায়, সুনীল
গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোৱ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, অমিতাভ দাশগুপ্ত, জয়
গোস্বামী, রাম বসু, নীৱেন্দ্রনাথ চক্ৰবৰ্তীসহ আৱও কয়েকজন কবিৱ কিছু ‘কমন’
কবিতা আবৃত্তি হয়ে থাকে। এই নিৰ্দিষ্ট গণিৱ ভেতৱে আমাদেৱ বেৱিয়ে আসতে
হবে। মনে রাখতে হবে আবৃত্তিৱ ক্ষেত্ৰে কবি মুখ্য নন, মুখ্য হচ্ছে কবিতা। সেটা
নীৱীন-প্ৰবীণ যাঁৱ কবিতাই হোক না কেন, আবৃত্তি কৱাৱ মতো হলৈই আমাদেৱ তা
নিৰ্মাণ কৱা উচিত।

নিৰ্মাণ প্ৰসঙ্গে :

আমৱা জেনে থাকব, কবিতা হচ্ছে সভ্যতাৱ আদি বা প্ৰাচীন শিল্পেৱ একটি। কাৱো
কাৱো মতে কবিতাৱ জন্মেৱ আগেও আবৃত্তিৱ জন্ম। মানব সভ্যতাৱ ইতিহাসে এ
শিল্পটি নানা আঙিকে, নানা ব্যঞ্জনায় নিজেৱ অস্তিত্বেৱ জানান দিতে দিতে আজকেৱ
পৰ্যায়ে এসে ঠেকেছে। এ প্ৰসঙ্গে দেবদুলাল বন্দেয়োপাধ্যায় ও অমিয় চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত ‘বিষয় : আবৃত্তি’ গ্ৰন্থে বিখ্যাত চিত্ৰকৱ রামানন্দ বন্দেয়োপাধ্যায় বলেন,
“কোন শিল্পীৱ জন্মাত্ৰ উদগত শব্দ-আবৃত্তি। আৱ এই আবৃত্তি সে কৱে চলেছে
সারাজীবন ধৰে, শেষ মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত। ...আবৃত্তি হচ্ছে অন্তৱেৱ অনুভূত জ্ঞান,
উপলক্ষ্মি-আবেগ প্ৰকাশ।”-এ যদি হয়ে থাকে আবৃত্তিৱ সংজ্ঞা, তাহলে এৱ আবাৱ
নিৰ্মাণ কী ? ঘটা কৱে নিৰ্মাণেৱ প্ৰশ্ন আসবেই বা কেন! এ প্ৰসঙ্গে যাওয়াৱ আগে
কবিতা এবং আবৃত্তি প্ৰসঙ্গে দু'চার কথা উচ্চারণ কৱা যাব।

‘কবিতা’ একটি আদি ও পৱিপূৰ্ণ শিল্প। এতে কাৱো দিখা থাকাৱ কথা না। কিন্তু
আবৃত্তি শিল্প কিনা তা নিয়ে এখনও অনেক অৱচীন প্ৰশ্ন কৱে থাকেন! কেউ কেউ
বলে থাকেন-কবিতা তো শিল্পই, তাহলে তাৱ আবাৱ ‘আবৃত্তি’ কৱাৱৰ প্ৰয়োজন পড়লো
কেন? উত্তৱটা দু'ভাবেই দেয়া যাব। প্ৰথমত : কবিতা যেমন স্বতন্ত্ৰ শিল্প, আবৃত্তিও
তাই। কবিতাৱ যেমন শিল্পমূল্য রয়েছে, আবৃত্তিৱও রয়েছে। তাই বলে কবিতা এবং
আবৃত্তি সমাৰ্থক নয় কথনও।

দ্বিতীয়ত : আমাদেৱ জানা থাকা দৱকাৱ-শিল্প থেকেও শিল্পেৱ সৃষ্টি হয়। যেমন- তুলা

(কটন) একটি শিল্প। তার থেকে তৈরি হয় সুতো, যাকে স্বতন্ত্রভাবে সুতো শিল্প বলা হয়। আবার সুতো থেকে তৈরি হয় বস্ত্র, যাকে বলা হয় বস্ত্র শিল্প। বস্ত্র থেকে উৎপন্ন হয় পোশাক ও অন্যান্য পণ্য; যার প্রতিটির রয়েছে স্বতন্ত্র শিল্পমূল্য ও পরিচয়। এ থেকে ধরে নেয়া যায়-কবিতা স্বতন্ত্র শিল্প হলেও তাকে উপকরণ হিসেবে অবলম্বন করে আরেকটি স্বতন্ত্র শিল্পের সৃষ্টি করা যায়। আর সেটা হচ্ছে আবৃত্তি বা আবৃত্তি শিল্প। এখানেই আবৃত্তির নির্মাণের প্রসঙ্গটা জরুরি হয়ে পড়ে।

উৎপল কুঞ্চি তাঁর ‘আবৃত্তি করার আগে’ গ্রন্থের অন্যত্র বলেছেন, “আজ আবৃত্তি বলতে যা বোঝায়, তাতে কবির কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। আবৃত্তি করেন কোনও দ্বিতীয়জন, যিনি সেই কবিতার রচয়িতা নন। কবিতাটির জন্মের পটভূমি ও যে-মনোভূমিতে কবিতাটির সৃষ্টি, তার কোনওটির সঙ্গেই তিনি জড়িত নন। তিনি একজন ভিন্ন মানুষ। ভিন্ন কণ্ঠ, ভিন্ন মনা, ভিন্ন স্বত্ব। এক ভিন্ন ব্যক্তিসত্ত্ব, যাঁর নিজস্ব রূচি রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব বোধ বুদ্ধি অভিজ্ঞতার জগৎ।আজকের আবৃত্তি তাই এক ভিন্ন শিল্প। আবৃত্তিকার সৃজিত শিল্প। কবিতা সেখানে শিল্পসৃষ্টির উপকরণ মাত্র। সেই শিল্পের উপভোগও ভিন্ন স্বাদের।”

এই ভিন্ন স্বাদের শিল্প সৃষ্টি কিংবা নির্মাণ করতে গেলে আমাদের নানা অনুষঙ্গের সংমিশ্রণ ঘটাতে হয়। একজন আবৃত্তিশিল্পীকে হতে হয় শিল্পীত ভাষা সন্ধানী, সুসংহত ও সংবেদনশীল। কেবল বিশুদ্ধ উচ্চারণ দিয়েই আবৃত্তি হয় না। নির্বাচিত কবিতার প্রতিমার সঙ্গে আবৃত্তিকারকে পরিচিত হতে হবে। কবিতার ভেতরগত ব্যঙ্গনাটি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হবে অন্তরে; বাইরে প্রকাশের কালে সেই ব্যঙ্গনাকে ঠিক ঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে। আবৃত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে আরও অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হয়। কবিতার ভাব-রস, তাল-লয়-ছন্দ, স্বর প্রক্ষেপন, বোঁক, অভিব্যক্তি, বোধ, বাচন ইত্যাদির শিল্পীত মিশ্রণ ও পরিস্ফূটনের মাধ্যমে শ্রোতার সাথে আবৃত্তিকার একটি সমন্বন্ধ রচনা করেন। যার মাধ্যমে তিনি শ্রোতার মনেও সংগ্রাম করেন কবিতার ভাব, বোধ ও অর্থকে। এখানে আবৃত্তিকারকে অবতীর্ণ হতে হয় পাকা রাঁধনীর ভূমিকায়। একজন পাকা রাঁধনীর জন্য পদ্মার ইলিশের প্রয়োজন পড়ে না, শঙ্খের মোহনার ইলিশও তিনি রক্ধনগুণে সুস্বাদু করে তুলতে পারেন।

লেখক : আবৃত্তিকার-সংগঠক ও সাংবাদিক।

আবৃত্তি নিয়ে দু'চার কথা

মাহুম আহমেদ

মা রান্না করছেন, পাশের রুমে পড়ছে ছেলে— “তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে”। ছেলের পড়া লক্ষ করেছেন মা। মারে মারে শুনতে পান, আবার পান না। এ সময় মা ছেলেকে বলেন – আবৃত্তি করে পড়ো। তা হলে আবৃত্তির অর্থ কী দাঁড়াল ? মা বলতে চেয়েছিলেন ‘শব্দ করে পড়ো-যাতে আমি শুনতে পাই। অর্থাৎ শব্দহীন আবৃত্তি হয় না। আবৃত্তি মানে জোরে পড়া। তবে পাঠ আর আবৃত্তি আবার এক নয়। চিঢ়কার করে পাঠ করলেই আবৃত্তি হবে কিনা এ বিষয়েও মতভিন্নতা রয়েছে। পাঠ হচ্ছে উলঙ্গ পঠন। এখানে কোন আবরণের বাধ্যবাধকতা নেই। আবৃত্তি সেটা নয়। এখানে প্রমিত উচ্চারণের কাপড় পরাতে হয়। নগ্নতা সভ্য হয় আবৃত্তিতে।

‘প্রমিত’ কী? ধরা যাক, প্রমিত হচ্ছে অমিতের বড় ভাই। পুরো নাম প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সবাই তাকে প্রমিত নামেই ডাকে। সেই কারণেই সে প্রমিত। প্রমিত উচ্চারণ কিংবা প্রমিত বানানও তাই। সবাই মিলে যে উচ্চারণটিকে প্রমিত বলে স্বীকৃতি দেয় সেটিই প্রমিত উচ্চারণ। ঔশ্ব হচ্ছে— সবাই কী এক সাথে মিলতে পারে। না পারে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানীরা মিলেন। কোনো কর্তৃপক্ষ সেই সম্মিলনের দায়িত্ব পালন করে। যেমন আমাদের দেশে আছে ‘বাংলা একাডেমী’। এই কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি উচ্চারণ অভিধান, বানান অভিধান— ইত্যাদি। এখানের উচ্চারণ বা বানানকেও প্রমিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

বিষয়টা দাঁড়াল এই, প্রমিত বিষয়টি উপর থেকে স্বীকৃত- আরোপিত, প্রাক্তজন অথবা সাধারণ জনতা নির্ধারিত কিছু নয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় বিশেষজ্ঞ-বিশেষজ্ঞ দৈরিথ হয়। দৈরিথ ভাষার উৎকর্মের জন্য ইতিবাচক। কিন্তু এ দৈরিথের উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় নষ্ট হলে ভাষা-নিয়ে রাজনীতির খেলা চলে। তখন প্রমিত হয়ে যায় একবারেই চাপিয়ে দেয়া বিষয়। আমরা সেই অপ-রাজনীতির দিকে যেতে চাই না। বরং প্রমিতকে নিজের করে নেয়া যেতে পারে এর সরল ব্যাখ্যার মাধ্যমে। যা শুনতে মধুর লাগে, যা শোনালে সবাই স্পষ্টভাবে শুনতে পায়, বুঝতে পারে সেটিই প্রমিত। জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় ভাষার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য।

আবৃত্তির কাজ কী? আবৃত্তি কোন কাজে লাগে? আগেই বলেছি আবৃত্তির ক্ষেত্রে শব্দকে প্রমিত উচ্চারণের জামা পরতে হয়। ঐ শব্দগুলো কোথাও ব্যবহৃত হয়? হয় কবিতায়, নয় গদ্য। গদ্য-পদ্য সবই আবৃত্তির আওতাধীন। আমরা জানি কবিতা হচ্ছে শব্দের মালা: The best words with best arrangements. মধুসূন্দন বলেছিলেন, কবি

তার কবিতায় শব্দে শব্দে বিয়ে দেয় ।

একটি শব্দের জীবন থাকে । আমরা একে বলি শব্দ-শক্তি । যেমন বজ্রপাতের শব্দে হঠাতে আমরা নড়ে-চড়ে উঠি । কিংবা সুনসান মিলনায়তনে হঠাতে মধ্যে নৃপুরের আওয়াজ, কুকুরের ডাক, শিশুর কানা, অট্টহাসি, গুলির শব্দ আমাদের আলাদা আলাদা ব্যঙ্গনা দেয় । এ শব্দগুলোর পৃথক জীবন রয়েছে । শব্দের এ জীবনকে জীবন্ত করে তোলে আবৃত্তি । অভিনয় যেমন আমাদের হাসায়, কাঁদায়, ভালোবাসার হাতছানি দেয়; আবৃত্তিও আবেগকে আলোড়িত করে, ভাবায়, বোধকে স্পর্শ করে আমাদের জাগিয়ে তোলে । আবৃত্তির ব্যবহারিক প্রয়োজনও অনেক দূর এগিয়ে গেছে । উন্নত বিশ্বে এখন ‘Recitation Therapy’ নামে চিকিৎসায় সেবা হিসাবে এটি কাজ করছে । একটি সঙ্গীত যেমন মন্তিকে বাতাবরণ তৈরি করে, আবৃত্তিও প্রতিটি লোমকূপকে স্পর্শ করে আবেগের স্ফূরণ ঘটাতে সক্ষম ।

আবৃত্তি আবার আন্দোলন সংগ্রামেরও হাতিয়ার । অধিকার আদায়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এ কর্তৃশিল্প । শুন্দি সাংস্কৃতিক চর্চা, আতঙ্কিদি-তৃষ্ণি আর আদর্শ বাস্তবায়নের পটভূমি হিসাবে সারা দেশেই গড়ে উঠেছে আবৃত্তি সংগঠন । আবৃত্তির ইই সাংগঠনিক চর্চা এ শিল্পে অনেক গতি সঞ্চার করেছে । নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আবৃত্তিতে । একক, দৈত, বৃন্দ, শ্রাতি উপস্থাপনের মাধ্যমে আবৃত্তির চর্চা চলছে । একই আদর্শের মেলবন্ধন ঘটাতে আবৃত্তি সংগঠনগুলোরও সংগঠন হচ্ছে । ‘বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ’ নামের সংগঠনে যুক্ত হয়েছে সারা দেশের প্রায় একশ’ সংগঠন । অঞ্চল ভেদেও মোর্চা রয়েছে । সম্মিলিত চর্চার মাধ্যমে আবৃত্তি এখন সাংস্কৃতিক শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে গেছে । একজন আবৃত্তিকারী এখন আর একা নয়, তার দুঃসময় আর আনন্দ আয়োজনে সাথী হচ্ছে আবৃত্তি-সারথীরা ।

দেশে এখন নানা মিডিয়ার ছড়াচড়ি । টেলিভিশনে খবর পাঠ, অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা, মধ্যে অভিনয়, সিনেমায় কঠ দেয়া, রেডিও জকি, ইত্যাদি নানা বিষয়ের জোয়ার । এ জোয়ারে পাল তুলে নৌকা ভাসানোর জন্য যোগ্য মানুষের বড় অভাব । পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে- টেলিভিশনে খবর পড়তে চান; প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে শুন্দি উচ্চারণে কথা বলা পারদর্শীরা যোগাযোগ করুন সরাসরি-এমন বিজ্ঞাপন । সঙ্গত কারণেই সুন্দরভাবে এবং শুন্দি বা প্রমিত উচ্চারণে কথা বলতে অনেকে আগ্রহী হয়ে এ সংক্রান্ত কর্মশালায় ভর্তি হয় । আবৃত্তি সংগঠনগুলোই প্রধানত এ সমন্ত কর্মশালা আয়োজন করে । এখানে প্রশিক্ষণার্থীরা উপকৃত হয় নিঃসন্দেহে । তবে কর্মশালায়ই তাকে একজন আবৃত্তিকার বা উপস্থাপক বানিয়ে দেবে বিষয়টি এমন নয় । এখানে কিছু পথের সন্ধান মেলে মাত্র । আর পথটা চলতে হয় নিজেকেই, নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে ।

রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলা । এটি এখন অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত । বিষয়টি অত্যন্ত বেদনাদায়ক । একুশে ফেরুয়ারি প্রভাতে একটি এফ এম রেডিও-তে জকি যখন বলে উঠে ‘আপনাদের সবাইকে টোয়েন্টি-ওয়ানের শুভেচ্ছা’ তখন আমাদের রফিক-আসাদুরা বেদনায় কেঁপে উঠেন । কিন্তু রাষ্ট্রের হয়ত সেখানে কিছু যায় আসে না । অন্যদিকে রেডিও কর্তৃপক্ষ তো এটাকেই স্মার্টনেস আর আধুনিকতা মনে করে টগবগ করে । বাংলা শব্দের উচ্চারণেও তারা আধুনিকতার প্রলেপ লাগিয়েছে । ‘র’ সেই উচ্চারণে স্লোটংশীনি আমাদের বাংলা ভাষা যেন পচা ডোবায় নিষ্ক্রিয় হয় ।

এ অবস্থার উত্তরণে আবৃত্তি সংগঠনের শুন্দি উচ্চারণ কর্মশালা একটি জাতীয় ও মৌলিক দায়িত্বই পালন করছে বৈকি । আর সেক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ চর্চা শুরু করতে পারলে কাজটি আরো অর্থবহ ও পাকাপোক্ত হতো ।

লেখক : শিক্ষক, দর্শন বিভাগ-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চবি আবৃত্তি মঞ্চ'র উপদেষ্টা ।

সংস্কৃতি : আঁধার পথের আলোকবর্তিকা

সেলিম রেজা সাগর

মফস্বল শহর থেকে এসে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম তখন দিগন্তজোড়া স্বপ্ন চোখে। নতুন পরিবেশ, চারিদিকে নতুন নতুন মানুষ, নতুন জীবন ভাবনা। সংকোচ-অসংকোচের দোলাচে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন বোনা। রঞ্চিন মত ফ্লাস, বন্ধুদের সাথে বিকেলে ঝুপড়িতে আড়ো, রাত জেগে তারঙ্গ উপভোগ করা সব যেন গল্পের মত। যেন বাবা-মা'র শাসন ভেঙে নতুন এক মুক্ত পৃথিবী। কিন্তু ক্ষণিকের এ ঘোর ভাঙ্গতে দেরি হয় নি। বিশ্ববিদ্যার আলয়ে এসে কেমন যেন অপূর্ণতার একটা ছায়া মনের মাঝে। শুধু কী এটুকুর জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি। আমাদের কী আর কিছু করার নেই, আর কোন দায় নেই? বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম একটা ডিছি নিয়ে বের হয়ে গেলাম, এতেই কী আমাদের সব দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল? চারিদিকে সৌন্দর্যের এত বিচ্ছিন্নতা তবুও যেন প্রাণের সুরটাকে ধরতে পারছি না।

বাঙালির সকল আদ্দোলন সংগ্রামের মূলে ছিল ছাত্র-সমাজ। শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিকসহ প্রতিটি আদ্দোলন-সংগ্রামকেই করেছে বেগবান। সাংস্কৃতিক কর্মীরা শিল্পকে করেছিলেন তাদের অন্ত। কিন্তু আজকের আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে ভাববার অবকাশ পাই না। আমাদের সামনে এখন একুশ শক্তকের বিশেষ আধুনিকতার হাতছানি। আমরা শিল্পের চর্চাকে সময়ের অপচয় বলে মনে করি। আমাদের কাছে এটা অবসর কাটাবার উপায়মাত্র। এখন আমরা জীবনের অর্থ খুঁজে ফিরি বিজ্ঞাপনের রঙিন দুনিয়ায়, ভিন্নদেশি অপসংস্কৃতিতে (কিছু কিছু ব্যক্তিক্রম অবশ্যই আছে যে সংখ্যা নগণ্য)।

আমাদের যুব সমাজ আজ বড় বেশি অস্থির। যতটা না জীবনের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব অর্জনের জন্য তার চেয়েও বেশি তাদের ভবিষ্যতের সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে। কারণ, আজকে পারিপূর্ণ প্রতিবেশ সুন্দর হবার, ফুল হয়ে ফুটবার এবং নৈতিক আদর্শের শিক্ষা দেয় না। শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে আজ রাজনীতির ভূত। কখনও মৌলবাদী সমাজের নিষ্ঠুর পীড়ন আবার কখনও আদর্শহীন অসৎ ছাত্র রাজনীতির যাত্রাকলে পিষ্ট হওয়া। সে জন্য আমাদের ভিতরের মানুষটা জেগে ওঠে না, আমরা আমাদের মননকে কাজে লাগাই না। আমরা হৃদয়কে শুন্দ করার পরিবর্তে ছুটে যাই শেয়ারবাজারের দিকে, এখন আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা আকর্ষণ করে না। যতটা করে কর্পোরেট দুনিয়া। তাহলে কী হবে আমাদের এই দেশের?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী তার স্ব-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজ ও সংস্কৃতির

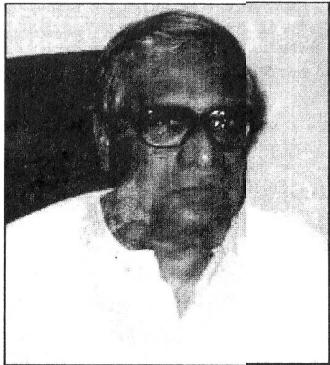
বার্তা বাহকও সে। কিন্তু আজ যেন আমরা এ বোধটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। একজন মানুষকে যথার্থ মানুষ হয়ে উঠার জন্য, জীবনের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোয় নিজেকে রাঙিয়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল পরিসরের সঙ্গে প্রয়োজন বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শুন্দা ও দায়িত্ববোধ। আর এ দায়িত্ববোধটা একার পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন সাংগঠনিক চর্চা। সাংগঠনিক চর্চার মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী তার নিজের ভিতরের মানুষটাকে আবিষ্কার করতে পারে। দশের সাথে নিজের ভাবনাগুলো আদান-প্রদানের সুযোগ পায়। এভাবেই শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে উন্নোব্র ঘটাতে পারে বোধের। আর বোধিক এ উত্তরণের দ্বারাই সে গড়ে ওঠে সমাজের তথা রাষ্ট্রের একজন সম্পদ হিসেবে। কারণ এ তরুণরাই তো প্রতি মুহূর্তে ঘোষণা করছে আমাদের নতুন নতুন বিজয়গাথা।

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের জীবিকা প্রয়োজন কিন্তু সত্যিকার মূল্যবোধে উত্তীর্ণ, শুন্দ চেতনাবোধ সম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠার জন্য শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা থাকা চাই; চাই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এর চর্চার জন্য সুষৃষ্টি পরিবেশ ও অবকাঠামো। এমন একটা মঞ্চ চাই যেখানে প্রতিদিন ছাত্ররা নিজেদের নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে মিলিত হবে। নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে পৌঁছে দেবে অনের কাছে, গড়ে তুলবে মানসিক মুক্তির একটা খোলা আকাশ। যেখান থেকে প্রতিক্ষণে ঘোষিত হবে স্বপ্নের একটা স্বদেশ বিনিমাগের দীপ্ত প্রত্যয়। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কী সে পরিবেশ আছে? জানি নেই, তবুও কিছু সংগঠন বহু কষ্টে এগিয়ে চলছে, শুধুমাত্র তাদের অফুরন্ত প্রীতি আছে বলেই, নিজেদের বোধের কাছে তারা দায়বদ্ধ বলেই। কিন্তু এভাবে কত দিন টিকে থাকবে আমাদের গৌরবের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য?

আমাদের সত্যিকার সাধীনতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিতে। আর এ মুক্তি ঘটবে তরুণ প্রজন্মের হাত ধরেই। প্রাণকে একটা গান্ধি সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের জাগতে হবে। তরুণ সমাজকে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মিথ্যার শৃংখল ভেঙে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের শিল্প সংস্কৃতিকে। ভিন্নদেশি নয়, আমরা বিজয়গাথা লিখব আমাদের মাটি ও মানুষের সাথে মিশে থাকা সাহিত্য ও শিল্পকলার। আমরা যারা আবৃত্তিকে আমাদের আঁধার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে নিয়েছি, তেমনি অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে। যুথবদ্ধভাবেই আমাদের রচনা করতে হবে নয়া উপাখ্যান। আজ জেগে উঠুক সব প্রাণ। এসো সবাই, ওই যে নতুন প্রভাতের সূর্য দেখা যায়...।

লেখক : আবৃত্তিকৰ্মী ও সংগঠক

আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা ২০১১



অনুপম সেন জ্ঞান বৃক্ষের ফল; মনমের ফলভাবে তিনি আনন্দ। শিক্ষক, দার্শনিক, লেখক, কবি হিসেবেই শুধু নয় – প্রগতি চেতনার বাতিঘর হিসেবে তিনি দেশের সারস্বত সমাজে একজন প্রণয় পূরুষ। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধি শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও ব্যাপ্ত।

সমকালীন শ্রেষ্ঠতম এই মানবসম্পদ

ড. অনুপম সেন-কে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

সম্মাননা ২০১১ প্রদান করতে পেরে আমরা বিনম্র
কৃতজ্ঞ।

অনুপম সেনের জন্ম ১৯৪০ সালের ৫ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরে। তাঁর মাতা মেহলতা সেন ও পিতা বীরেন্দ্রলাল সেন। বীরেন্দ্রলাল সেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এম.এ. এবং রিপোর্ট কলেজ থেকে বি.এল. ডিপ্রি অর্জন করে ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম কোর্টে ওকালতিতে এম.এ. প্রমাতায় হিলেন বিশ্বিক্ষিত প্রতিত তিব্বত-পরিব্রাজক শরৎচন্দ্র দাশ। শরৎচন্দ্র কর্তৃক তিব্বত থেকে উকারকৃত ও অনুসিদ্ধ মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের বৈধিক্য অবদান-এর গল্প অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ রচনা কলে ‘শ্যামা’ ‘পূজারিনী’ প্রতিত অসাধারণ নৃত্যনাট্য ও কবিতা। তাঁর জোরাউতাত (বড় চাপ) কবি-সমালোচক শশাঙ্কহুরেন সেন স্যার আঙ্গোষ্ঠী মুঠোপাধ্যায়ের আম্ভৱণে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ খোলা হলে সেখানে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। স্বাভাবিক যে অনুপম সেন শৈশব থেকেই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠার সুযোগ পান।

অনুপম সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৬৩ সালে এম.এ. ডিপ্রি অর্জন করেন সমাজতত্ত্বে পরে কানাডার ম্যাকমাট্টের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৪ সালে এম.এ. ও ১৯৭৯ সালে পি.এইচ.ডি. ডিপ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (তখন E.P.U.E.T) প্রভাষক হিসেবে শিখেন প্রকাশক যোগ দিয়ে পরে ১৯৬৬ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ চার দশক ধরে শিক্ষকতা পেশায় দ্রুত হিলেন।

সমাজতত্ত্ব এবং সাহিত্য-শিক্ষকদলে প্রিভিন্ন বিষয়ে বহু প্রচের করেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশক Rutledge তাঁর The State, Industrialization and Class Formations in India গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। তাঁর ‘বাংলাদেশ : সমাজ ও রাষ্ট্র’, ‘বাংলাদেশ ও বাংলাতে : রেনেসাঁস, স্বাধীনতা-চিন্তা ও আত্মানুসন্ধান’, ‘বিলসি শব্দগুচ্ছ’, ‘সুন্দরের বিচার সভাতে’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশকে আনন্দ হয়েছে।

১৯৭১ সালে যখন তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তখন সক্রিয়ভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে মানবের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন সংগ্রামে যুক্ত আছেন। ১৯৮৩-৮৪ সালে ‘বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনে’র সভাপতি হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী শিক্ষক-সমাজ সামরিক আইন উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে এসেছিল এদেশের মানবের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য।

১৯৬০ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও যুক্ত রয়েছে। বর্তমানে তিনি প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্মরণে আনন্দ অনুষ্ঠান

ক্রিতিপুর

ষষ্ঠ



২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ২০১১ রবি ও সোমবার
প্রতিমিম সকাল ১০টা থেকে
সমাজবিজ্ঞান অনুষদ বিদ্যালয়ে।

আবৃত্তি মঞ্চ সম্মাননা: প্রফেসর ড. অনুপম সেন
কবি ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী

প্রধান অতিথি: প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন
উপচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্বোধক: ভাষ্যকারী বন্দেয়াপাধ্যায়
বিশিষ্ট আবৃত্তিকর ও অভিযন্তে।

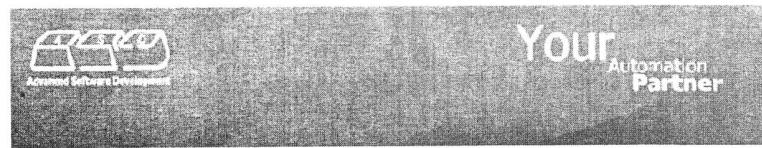
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ
আবৃত্তি উৎসব ২০১১

২৩ জানুয়ারি রোবোট

সকাল ১০ টা	: উৎসব শোভাযাত্রা।
সকাল ১০.৩০ টা	: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
আবৃত্তি মঞ্চ সম্মিলন	: ক. অনুশৰ্ম সেন, কার্য এ বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী
প্রধান অর্থিত্ব	: একাফসর ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, উপচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
উদ্বোধক	: তার বক্সে পাখার, বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী ও অভিনেতা।
অঙ্গীকৃত বক্তব্য	: ক. মনিকুমারী, কবি ও বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী।
সভাপত্রিকা	: জে.জে.জি. প্রকাশ সন্ত, চিম-সমাজবিজ্ঞান অনুষদ চ.বি.
সভাপত্রিকা	: মাঝে আহমেদ, পিচক-সর্বীন বিভাগ, চবি ও উপসচৰ্চা, চবি আবৃত্তি মঞ্চ।
স্বাক্ষর বক্তব্য	: সেলিম রেজা সামৰ, আহবারক, উৎসব উন্নয়ন কর্মসূচি।
বেলা ১২ টা	: চবি আবৃত্তি মঞ্চ ক্ষমতা প্রযোজন চেতনা, এছন্ত: হাসন বিম্বন্তে নাহার ও তাজমুন হীরা নির্দেশনা। হাসন বিম্বন্তে নাহার
দুপুর ১২.৩০ টা	: অংশগ্রহণ- ক্ষমা দাশ, সোখা, কিমা, বাবেদা, সুমি, আহমেদ ও কামাল; সঙ্গীত- বীণা দাশ ও সুমন (অভিষি শিশি)
দুপুর ১.১৫ টা	: একক পরিবেশনা- করফেন দাশ, শাকের তাহের, পৰীর পাল
দুপুর ১.৪৫ টা	: সঙ্গীত পরিবেশনা- উর্মিচী, চ.বি.
বিকেল ২.৩০ টা	: আবৃত্তিত ক্ষমতা প্রযোজন করিতে পাঠ- ক. মনিকুমারীমাম, অরূপ সেন, আবু মুসা চৌধুরী, আবীরু সেন, রাখেন পটুক ও শুভীক বুলবুল
বিকেল ২.৪৫ টা	: সঙ্গীত পরিবেশনা- প্রয়া, চট্টগ্রাম
উপস্থপনা	: একক পরিবেশনা- রশিদিন রশিদ ও তার বক্সে পাখারায়
২৪ জানুয়ারি সোমবার	: কৃতি ও হীরা
সকাল ১১ টা	: আবৃত্তিন- ক. মনিকুমারীমাম, করি ও বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী।
বেলা ১২ টা	: ক. মাহমুদুল হক, একাফসর বালো বিভাগ, চবি
দুপুর ১ টা	: কুলুক বাঢ়া, পিচক, নটিকলা বিভাগ, চবি। অঙ্গীকৃত দাশ, শিক্ষক, মটিকলা বিভাগ, চবি। মাঝে আহমেদ, পিচক, মর্ম বিভাগ, চবি।
দুপুর ১.১৫ টা	: অংশগ্রহণ ক্ষমতা প্রযোজন করিতে পাঠ- একাজ ইউনিফো, গুর কায়সার, বিশ্বভিত্তি চৌধুরী, অক্ষতা হোসাইন, বালিন আহমেদ, কর্মকল হাসন বাদল, হাফিজ বশিদ খান, শাহিদ আহমেদ, সেলিম রেজা তিমুহ চৌধুরী।
দুপুর ১.৪৫ টা	: প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনা- বৃক্ষ অক্ষর একুশে
বিকেল ২ টা	: এছন্ত: হাসন বিম্বন্তে নাহার দানু
বিকেল ২.৩০ টা	: অংশগ্রহণ- মাঝমুল হাসন, যাহানা, কুমি নূর, হানিফ, ভালিয়া, গ্রান্ডিকা, ফয়সাল ও মোতাহের নির্দেশনা। মাহমুদ আফতোজ।
উপস্থপনা	: অংশগ্রহণ- মাঝমুল হুসি, সেলিম রেজা সামৰ, হাসন বিম্বন্তে নাহার, আখতারুল্লামাম লাবু, কুলুক হীরা, কামাল উদীন, সঙ্গীত : বীণা দাশ ও সুমন (অভিষি শিশি)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ
কালান্তর ৩৮



Scope of Service

Application Software Development

Device and Drvr Applications Development

Web Application

E Commerce Solution

Mobile Application Design and Development

Database Management

Design and Commissioning of Structured LAN, WAN

IT Consultancy

Helpdesk support

Outsourcing



eMediaDesk

<http://www.emedia.asdtd.com>
access | analyze | decide

Our Products

HRIS - Human Resource Information System

Customizable ERP

Mobile Banking System

ATM Monitoring System

Online Bill Tracking System

Dynamic Library and Archive Management System

Cheque Writer Solution

DMS - Document Management System

Auto Bills Pay Solution

Advanced Software Development

House# 432,Road# 30
New DOHS,Mohakhali,
Dhaka-1206

Phone: 88 02 8852823
88 01714042726
88 01714047305

info@asdtd.com www.asdtd.com www.emedia.asdtd.com

With best Compliments...

**Didarul Alam Dulu
Director**

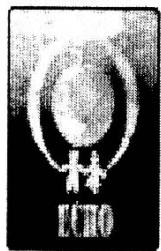
Nandonik Khuthi

237 Samsi Colony, Lakan Bazar
Chittagong. Ph : 01611-177777



E-mail : kcnl.ctg@gmail.com

With best Compliments...



ECHO

(Effective Creation on Human Opinion)
non government social development organization

1331, Delawar Building (1st Floor), Alfala Goli, East
Nasirabad, Khulshi, Chittagong, Bangladesh
Mobile : 01711133628, 01818397345, 01675369900
E-mail : echobangladesh@gmail.com, echoctg@yahoo.com

With the best compliments....



S.A GROUP OF INDUSTRIES

HEAD OFFICE : Finlay House (3rd Floor), Agrabad C/A, Chittagong. Tel. 880-31-2525012-4, 720728, 720178, 03930080306-8 Fax . 880-31-2525015, 2525797 E-mail : info@sagroupbd.com
DHAKA OFFICE : Road - 134, Block - SE (A), Plot - 1, Gulshan - 1, Dhaka - 1212, Bangladesh. Tel. 880-2-8831673, 88311661 Fax : 880-2-9887407

- | | | | |
|---|---|---|--|
| S.A. OIL REFINERY LIMITED | LAILA VANASPATI PRODUCTS LIMITED | S.A. BEVERAGE LIMITED | S.A. POWER GENERATION LIMITED |
| SAMANNAZ SUPER OILS LIMITED | SAMANNAZ CONDENSED MILK LIMITED | S.A. PULP & PAPER PRODUCTS LIMITED | SOUTH EASTERN TANK TERMINAL LIMITED |
| KAMAL VEGETABLE OILS LIMITED | SAMANNAZ DAIRY & FOOD PRODUCTS LIMITED | SHARIJA CEMENT LIMITED | S.A. TANK TERMINAL LIMITED |
| SHARIJA OIL REFINERY LIMITED | S.A. CONSUMER PRODUCTS LIMITED | SOUTH EASTERN PAPER MILLS LIMITED | S.A. TELECOM SYSTEM LIMITED |
| SOUTH EASTERN OIL REFINERY LIMITED | S.A. SALT INDUSTRIES LIMITED | S.A. PROPERTIES LIMITED | |